নূরে সেরহিন্দ

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

‘হে প্রভু
আমাদেরকে
দাও, সুন্দর পৃথিবী
এবং সুন্দর আখেরাত এবং
আমাদেরকে রক্ষা
করো অগ্নি
আজাব
থেকে’

নূরে সেরহিন্দ

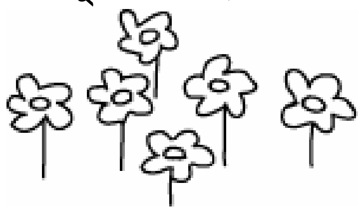

হজরত মোজাদ্দেদে
আলফে সানি (রহ:)-এর
অবিস্মরণীয় জীবন কথা

- মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ

নূরে সেরহিন্দ
মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

২য় প্রকাশ ঃ জুন, ১৯৮৭ ইং
৩য় প্রকাশ ঃ আগস্ট, ১৯৯৩ ইং
৪র্থ প্রকাশ ঃ আগস্ট, ১৯৯৫ ইং
৫ম প্রকাশ ঃ অক্টোবর, ১৯৯৯ ইং
৬ষ্ঠ প্রকাশ ঃ নভেম্বর, ২০০২ ইং
৭ম প্রকাশ ঃ মে, ২০০৮ ইং

প্রকাশক
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ

প্রচ্ছদ
আব্দুর রোউফ সরকার

মুদ্রণ
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫-৩০২৭৩১

বিনিময় ঃ একশত টাকা মাত্র

NOOR-E-SERHIND, a life Sketch of Hazrat Mozaddede Alfesani (Rh.) written by Mohammad Mamunur Rashid in Bengalee & Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia.

Exchange Taka 100/- U.S.$ 10.00

ISBN 984-70240-0028-3

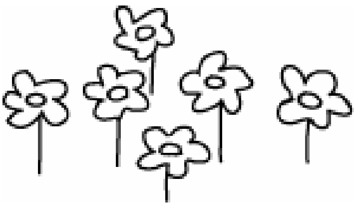

আশেক জনের দিলে সেরহিন্দের স্মৃতি
এখনো ফোটায় ফুল বুক থেকে বুকে
অনন্ত সে নূরের কভু হয়নাকো ইতি
গোপন মিলন হয় আশেক মাশুকে।

মদীনা মদিরা ঘ্রাণে মাতাল কাফেলা
তোমার হেরেম হতে জারী রয়, রবে
আরব আজম জুড়ে বিজয়ের মেলা
সুবাস এখনো আনে প্রতি অনুভবে।

নেসবতে সিদ্দিকীর অপরূপ শোভা
তোমারই জবানে জানে দুনিয়ার লোক
হাজার বছর পরে কোটি সূর্য-প্রভা
দ্বীনের আকাশে জ্বেলে ছেড়েছ ভূলোক।

বুলন্দ করেছ তুমি আল্লাহ্‌র কালাম
মহীয়ান মোজাদ্দেদ সালাম সালাম।

আমাদের বই

- তাফ্সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
- মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
- মুকাশিফাতে আয়নিয়া
- মাআরিফে লাদুন্নিয়া
- মাব্দা ওয়া মা'আদ
- মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
- নক্শায়ে নক্শবন্দ
- বায়ানুল বাকী
- জীলান সূর্যের হাতছানি
- চেরাগে চিশ্তী
- কালিয়ারের কুতুব
- প্রথম পরিবার
- মহাপ্রেমিক মুসা
- তুমিতো মোর্শেদ মহান
- নবীনন্দিনী
- পিতা ইব্রাহীম
- আবার আসবেন তিনি
- সুন্দর ইতিবৃত্ত
- ফোরাতের তীর
- মহাপ্লাবনের কাহিনী
- দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন
- কী হয়েছিলো অবাধ্যদের
- THE PATH
- পথ পরিচিতি
- নামাজের নিয়ম
- রমজান মাস
- ইসলামী বিশ্বাস
- BASICS IN ISLAM
- মালাবুদ্দা মিনহু
- সোনার শিকল
- বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন
- সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
- তৃষিত তিথির অতিথি
- ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
- নীড়ে তার নীল ঢেউ
- ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

এই কেতাব 'নূরে সেরহিন্দ' আমার প্রাণপ্রিয় পীর ও মোর্শেদ হজরত হাকিম আবদুল হাকিম রহমতুল্লাহি আলাইহি সাহেবের মোবারক নির্দেশে রচিত হইয়াছে। বাদশাহ্ যেমন তাঁহার অধীনস্ত কোন কর্মচারীর সাহায্যে বিশেষ কোন কার্য সম্পাদন করান, তেমনি হজরত মোর্শেদ কেবলা (রহঃ) সাহেবও এই গুণাহ্গার ফকিরের দ্বারা এই কেতাব রচনার কাজ সম্পন্ন করাইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা তাঁহার খাস তাওয়াজ্জোহ্ এরই প্রতিফল।

কেতাব খানি প্রায় চারি বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছে। রচনা কালে বিভিন্ন লেখকের অনেক কয়টি কেতাবের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছি। তাহাদের প্রকৃত সংখ্যা এখন মনে নাই। লেখকদের সবার নাম এবং কেতাবগুলির অধিকাংশের নামও স্মরণ করিতে পারিতেছি না। তাই গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া সম্ভব হইল না।

'নূরে সেরহিন্দ' ইমামে রব্বানী হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দি রহমতুল্লাহি আলাইহি সাহেবের অবিস্মরণীয় জীবনকাহিনী। একজন খালেস আশেকের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন তাঁহার এই জীবনকাহিনীতে সহজ ও প্রেমময় ভাষায় প্রস্ফুটিত করিয়া তোলার প্রয়াস পাইয়াছি। ইহা ছাড়া হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি (রহঃ) এর তাজদিদি কর্মসূচীর সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট প্রতিচ্ছবিও ইহাতে তুলিয়া ধরার চেষ্টা করা হইয়াছে। অধমের দৃঢ় আশা ইহা আল্লাহ্পাকের দরবারে মকবুল হইবে।

ভিখারীর শূন্য বুকে আছে শুধু আশা,
তোমারই রহম 'পরে অসীম ভরসা।

প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে হজরত মোর্শেদ কেবলা (রহঃ) দুনিয়াবাসীদের মায়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। আজ যদি এই 'নূরে সেরহিন্দ' তাঁহার হাতে পড়িত তবে নিশ্চয় আনন্দে তাঁহার দুই চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠিত। তিনি ছিলেন হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি (রহঃ) এর শ্রেষ্ঠতম আশেকগণের কাতারভুক্ত এক রহস্যময় ও বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। এই বিরহী ফকিরের আপাদমস্তক তাঁহার খাস এহসানে পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হইয়া আছে। ইহার জন্য পূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আলহামদু লিল্লাহ্।

'নূরে সেরহিন্দ' প্রকাশের ব্যাপারে যাঁহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন প্রকারের সহযোগিতা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের জন্যই দোয়া করি। আল্লাহ্পাক তাঁহাদের সবাইকে জাজায়ে খায়ের দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

নাহমাদুহু ওয়ানুসল্লি আলা রসূলিহিল কারীম।

আল্লাহ্‌পাকের অপার অনুগ্রহে তৃতীয়বারের মতো প্রকাশিত হলো নূরে সেরহিন্দ। পাঠকবৃন্দের জ্ঞাতার্থে জানাই-মহান মোর্শেদ হজরত হাকিম আবদুল হাকিম (রহঃ)-এর মোবারক নির্দেশে প্রায় আট নয় বছর আগে এই ফকিরের হাতে রচিত হয়েছে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রহঃ)-এর অবিস্মরণীয় জীবন কাহিনী 'নূরে সেরহিন্দ'। আল্লাহপাক এই গ্রন্থের ব্যাপক প্রসার করুন। আমিন। সাম্প্রতিক কালের বিশ্ব পরিস্থিতি অশান্ত। মানবতার অবক্ষয় রোধ করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলামে। প্রত্যাবর্তন যত দ্রুততর হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু প্রধান প্রতিবন্ধকতা আসছে আমাদের নিজেদের দিক থেকেই। এর কারণ দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা। এই সংকীর্ণতার প্রাচীর আমাদেরকে ভাঙতেই হবে। যুগে যুগে দ্বীনের সংস্কারক যাঁরা আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়-প্রথমেই তাঁরা সময় ব্যয় করেছেন পূর্ণ-দ্বীনের সাজে সজ্জিত হবার জন্য। শরণাপন্ন হয়েছেন জাহেরী এলেম শিক্ষার জন্য আলেমগণের এবং রূহানী শিক্ষার জন্য পীর মাশায়েখগণের। তারপর শুরু করেছেন দ্বীনের সংস্কার আন্দোলন। তাই তাঁদের আন্দোলন ছিল গায়েবী মদদ সম্পন্ন। যার প্রতিফল হচ্ছে পূর্ণ বিজয়। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রহঃ) এর সংস্কার আন্দোলন ছিল অধিকতর পূর্ণ। কারণ, তিনি শতাব্দীর সংস্কারক ছিলেন না। ছিলেন সহস্রাব্দের সংস্কারক। আমরা ধারণা করি, সংস্কার আন্দোলনের যে বৈপ্লবিক রূপরেখা তিনি প্রণয়ন করেছেন, তা আজো পুরাপুরি অনুসরণযোগ্য। আমরা আরো ধারণা করি– দ্বীনের স্বার্থে আমাদের ওলামা ও মাশায়েখগণকে অবশ্যই হজরতের জীবন ও কর্মপদ্ধতির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিবন্ধ করতে হবে। শুধু তাই নয়, শক্তিশালী রূহানিয়াত অর্জনের জন্য দ্বীনের এই মহান শিক্ষক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যুগোপযোগী তরিকায় দাখেলও হতে হবে। তরিকায়ে খাস মোজাদ্দেদিয়ার মাধ্যমে আজো জারী রয়েছে দ্বীনের অফুরন্ত প্রাণপ্রবাহ (রূহানিয়াত)। আমরা এই জামাতে দাখেল হবার জন্য সকল স্তরের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দকে সেরহিন্দ প্রকাশনের পুস্তকসমূহের মাধ্যমে বার বার আহবান জানিয়ে যাচ্ছি। এবারও জানাচ্ছি। ওয়াস্‌ সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ

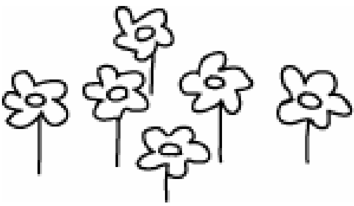

রাত্রির আঁধার বিলীন হইতেছে। সোবহে সাদেকের আলোর পরশে সুপ্ত পৃথিবী জাগিয়া উঠিতেছে। শীতল হাওয়া দুলিয়া দুলিয়া ঘোষণা করিতেছে আনন্দ বারতা।

সেরহিন্দের মাটিতে আজ কিসের যেন মহফিল বসিয়াছে। আসমানের সেতারা তাই অবাক হইয়া নির্নিমেষ নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তরুলতায় চলিতেছে কানাকানি। চারিপাশের মৌন প্রকৃতি গর্বে বুক ভরিয়া আনন্দের নিঃশ্বাস লইতেছে। সমুদ্র, পবর্ত, আকাশ, পৃথিবী, স্বর্গ, মর্ত সর্বত্রই আজ আনন্দ কলরোল। তামাম মখলুকের হৃদয় আজ পুলকে ভরপুর।

বহুদিন যেন তাহারা এমন করিয়া আনন্দ করে নাই। হাজার বছর আগে মখলুকে এমনি কাঁপন লাগিয়াছিল। হাজার বছর আগে ১২ই রবিউল আউয়াল– যেদিন আল্লাহ্‌র হাবীব সাল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নশ্বর পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন– সেই দিন। তারপর হাজার বছর গত হইয়াছে। প্রকৃতির বিমর্ষ বদনে আর এমন করিয়া হাসি ফোটে নাই। আজ আবার হাসি ফুটিল। হাজার বছর আগের সেই মাতাল সুরভিতে হিল্লোলিত হইল তামাম মখলুক। এ যেন অবিকল সেই খুশবু-মরু-মক্কার বুকে যাহার পবিত্র বিকাশ ঘটিয়াছিল।

সেরহিন্দের এক নিভৃত গৃহে এক পুণ্যময়ী মহিলার প্রসব বেদনা আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে তিনি যেন অচৈতন্য হইয়া পড়িতেছেন। স্থুল জগতের সম্পর্ক বিলুপ্ত হইল। রূহানী জগতের দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন সমস্ত নবী আ.গণ, অলিগণ এবং ফেরেস্তাগণ সত্তর হাজার নিশানসহ তাঁহার ঘরে তশরীফ আনিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহার সন্তানের উচ্চ মর্যাদার কথা বর্ণনা করিতেছেন।

মোবারক সন্তান ভূমিষ্ট হইল। পিতা শায়েখ আব্দুল আহাদ র. দেখিলেন, হজরত রসুলেপাক সাল্লালহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম আ. ও অগণিত ফেরেস্তাসহ তশরীফ আনিয়াছেন। তিনি নবজাত শিশুকে মোবারকবাদ জানাইলেন এবং স্বয়ং নবজাতকের কানে আজান ও একামত বলিলেন। কেমন করিয়া হজরত সাল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এখানে তশরীফ না লইয়া থাকিতে পারিবেন? হাজার বছর পূর্বে তাঁহার সহিত যে নূরের তিরোধান ঘটিয়াছিল– হাজার বছর পরে এই গৃহেই যে সেই নূরের প্রতিবিম্ব প্রকাশিত হইতেছে। এ যেন তাঁহার নিজেরই প্রকাশ।

তামাম মখলুক প্রাণ ভরিয়া নিঃশ্বাস লইল। যেন তাহার হাজার বছরের তৃষ্ণা আজ মিটিয়াছে। নবজাতকের আবির্ভাবে যেন তাহার বহুদিনের সুপ্ত আশা পূর্ণ হইয়াছে। প্রকৃতি সজীব হইল। দিকে দিকে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগিল। জুলমতের মৃত্যুঘন্টা বাজিল। নূর প্রকাশিত হইতে লাগিল।

শয়তান বিপদ গণিল। প্রবল প্রতাপশালী বাদশাহ্ আকবরের সিংহাসন উপুড় হইয়া পড়িল। সোজা করার জন্য চেষ্টা করা হইল। কিন্তু কোন ফল হইল না। ইহা ছাড়া বাদশাহ্ দেখিলেন এক ভয়ানক স্বপ্ন। স্বপ্নের কথা পণ্ডিতগণকে জানাইলে তাঁহারা বলিলেন, একজন মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে। তিনি রাজ্যব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করিবেন।

বাদ্যযন্ত্র অচল হইল। গায়ক-গায়িকা, আমোদ-প্রমোদকারী, নর্তকী সবাই হতভম্ব হইয়া দুষ্কার্য হইতে বিরত হইল। সেমা ও গেনাকারীগণের হাল বন্ধ হইল। তাঁহারা কাশফের মাধ্যমে নবজাতকের ফজিলত ও উচ্চা মর্তবা সম্পর্কে জ্ঞাত হইলেন। সমস্ত অলিগণ মুখ ফিরাইলেন তাঁহার দিকে।

নিশি অবসান হইল। বিলীয়মান চাঁদ, সেতারা, উদীয়মান সূর্য, পাহাড়, তরু– তামাম মখলুক বিনীত হইয়া পরম শ্রদ্ধাভরে মোবারকবাদ জানাইল এই পবিত্র শিশুকে।

মারহাবা মারহাবা ইয়া ‘মোজাদ্দেদ’
খোশ আমদেদ-তোমায় জানাই খোশ আমদেদ
মারহাবা ইয়া ইমামে রব্বানী
মারহাবা ইয়া কাইয়ুমে জামানী।

১৪ই শাওয়াল, ৯৭১ হিজরী জুমআর রাতে সোবহে সাদেকের সময় আবির্ভূত এই নবজাতক যাঁহার জন্য সমস্ত মখলুকের এই ব্যস্ততা– তাঁহার নাম রাখা হইল শায়েখ আহমদ। হাবীবেপাক সাল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের

হাজার বছর পর তিনি আসিলেন তাঁহারই নূরে পুনরায় তামাম ভূলোক মনওয়ার করিবার জন্য। বেদাত-কুফরীর অন্ধকার হইতে পথভোলা মানবকে তাঁহারই প্রদর্শিত পথে চালিত করিবার জন্য।

মহাপুরুষগণের আগমনের সংবাদ পূর্বেই ঘোষিত হইয়া থাকে। আখেরী জামানার পয়গম্বর হাবীবেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের সংবাদ পূর্ববর্তী উলুল আজম পয়গম্বর আ.গণ পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছেন। তেমনি তাঁহার জেল বা প্রতিবিম্ব শায়েখ আহমদ ফারূকী সেরহিন্দি র. এর আগমনের সংবাদও পূর্ববর্তী বহু উচ্চমর্তবাসম্পন্ন মাশায়েখগণ কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছিল।

স্বয়ং রসুলেপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় হাজার বছরের মোজাদ্দেদের আবির্ভাবের ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ফরমাইয়াছেন, 'হিজরতের একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আল্লাহ্পাক এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিবেন যিনি একটি বৃহৎ নূর। তাঁহার নাম হইবে আমার নামের অনুরূপ। দুই অত্যাচারী বাদশাহ্র মধ্যবর্তী সময়ে তিনি আবির্ভূত হইবেন এবং তাঁহার শাফায়াতে অসংখ্য ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে।'

গাউসে পাক হজরত আব্দুল কাদের জীলানী র.ও তাঁহার আবির্ভাবের সংবাদ জানিতে পরিয়াছিলেন। একদিন গাউসে পাক র. কোন এক জঙ্গলে মোরাকাবায় বসিলে সহসা তাঁহার সম্মুখে এক অতি উজ্জ্বল নূরের আবির্ভাব হইল। সেই নূরের আলোকে সমস্ত দুনিয়া আলোকিত হইয়া উঠিল। তাঁহার প্রতি এলহাম হইল– 'হে গাউসে পাক! তোমার পাঁচশত বছর পরে জগত শেরেক বেদাতের তমসায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে। সেই সময় উম্মতে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর মধ্য হইতে একজন অদ্বিতীয় অলি আল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি শেরেক, বেদাত এবং নাস্তিকতাকে ধ্বংস করিবেন। ইসলামের প্রারম্ভের সৌন্দর্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। স্পর্শমণিতুল্য হইবে তাঁহার সহবত। তাঁহার সাহেবজাদাগণ এবং খলিফাগণ আল্লাহ্পাকের খাস দরবারের মেহ্মান হইবেন।'

এই এলহাম শুনিয়া তিনি তাঁহার খেরকা মোবারককে বিশেষ কামালতে পরিপূর্ণ করিয়া সাহেবজাদা সৈয়দ তাজউদ্দিন আবদুর রাজ্জাক র. এর নিকট

আমানত রাখিলেন এবং নির্দেশ দিলেন– যখন সেই মহান বুজর্গ আত্মপ্রকাশ করিবেন, তখন যেন এই খেরকা শরীফ তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

মাকামাতে শায়খুল ইসলাম আহমদ জাম কু. একদিন এরশাদ করিয়াছিলেন, 'আমার পরে আমার নামধারী সতেরজন বুজর্গ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জন জন্মলাভ করিবেন আমার চারিশত বৎসর পর'।

উক্ত শায়েখের পুত্র শায়েখ জহুরউদ্দিন কু. একদিন তাঁহার নিকট আরজ করিলেন 'বড় বড় মাশায়েখগণের হালাত কেতাবে লিপিবদ্ধ আছে– কিন্তু আপনার অবস্থা উহা হইতে বহু উচ্চে।' তিনি বলিলেন– 'আমার চারিশত বছর পরে আমার নামে এক অসাধারণ বুজর্গ ব্যক্তি আবির্ভূত হইবেন। তাঁহার অবস্থা আমার চাইতে বহুগুণে উন্নত হইবে এবং তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাধারী হইবেন।'

শায়েখ আহমদ জাম কু. আফসোস করিয়া বলিয়াছেন– 'সোবহানাল্লাহ! খাজেগানে নকশ্‌বন্দিয়া সিলসিলায় একজন অদ্বিতীয় বুজর্গ হিন্দুস্তানে পয়দা হইবেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য না হইলে আমি বড়ই ব্যথিত হইব।' তিনি হজরত শায়েখ আহমদ র. এর নিকট একখানি পত্র লিখিয়া গিয়াছিলেন। শায়েখ আহমদ র. এর আবির্ভাবের পরে ১০২২ সালে সেই চিঠি তাঁহার নিকট পৌঁছানো হয়। উক্ত চিঠিতে তিনি শায়েখ আহমদ র. এর নিকট দোয়া চাহিয়াছিলেন।

হজরত শায়েখ আহমদ র. এর বুজর্গ পিতা হজরত আব্দুল আহাদ র. একদিন মোরাকাবায় বসিয়া দেখিতে পাইলেন, তামাম দুনিয়া তমসাচ্ছন্ন। হিংস্র পশুরা মানবকুলকে আক্রমণ করিয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিতেছে। সহসা একি হইল! তাঁহার বুক হইতে একটি অতি উজ্জ্বল নূর বাহির হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে নূরান্বিত করিয়া ফেলিল। সেই নূরের জালওয়ায় হিংস্র প্রাণীকুল জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া গেল। পুনরায় দেখিলেন, সিংহাসনে উপবিষ্ট এক মহান বুজর্গ। তাঁহার সামনে বহু নূরানী মানুষ ও ফেরেশতা আদবের সহিত দণ্ডায়মান। সেই পবিত্র বুজর্গের সম্মুখে জিন্দিক, নাস্তিক এবং জালেমদেরকে পশুর মতো জবাই করা হইতেছে। সেই সঙ্গে এক ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে ঃ-

কুল জায়াল হাক্কো ওয়া জাহাকাল বাতিল–
ইন্নাল বাতিলা কানা জাহূক্বা।

শায়েখ আবদুল আহাদ র. এই অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তৎকালীন বিখ্যাত বুজর্গ শাহ্ কামাল কায়থলী র. এর নিকট গিয়া তিনি সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করিলেন। হজরত কায়থলী র. ইহার তাবীর বর্ণনা করিলেন। বলিলেন, 'আপনার এক পবিত্র পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি হইবেন উম্মতে মোহাম্মদী সাল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে সর্বাধিক উচ্চ

মর্তবাসম্পন্ন অলি। তাঁহার নূরে সারা জাহান মনওয়ার হইবে। তিনি দীন ইসলামকে নতুন জীবন দান করিবেন।'

হজরত রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও বিভিন্ন আউলিয়ায়ে কেরামের ভবিষ্যৎবাণী এবং শায়েখ আব্দুল আহাদ র. এর কাশফ্ অবশেষে সফল হইল। সেরহিন্দের পবিত্র ভূমিতে জন্ম নিলেন সেই মহান বুজর্গ শায়েখ আহমদ র.। প্রকৃতির বুকে আনন্দের মাতম উঠিল। ভয় নাই। আর কোন চিন্তাভাবনা নাই। শয়তানের রাজত্বে এবার ইনকেলাব ঘটিবে। সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইবে ইসলামবিরোধী শক্তির জুলমত। কাবার নূরে আবার জগত আলোকিত হইবে। গুলে মদীনার খুশবুতে দুনিয়ায় আবার নামিবে বেহেশতি শান্তি। সেরহিন্দের পবিত্র মাটিতে আজ তাহারই আয়োজন চলিতেছে।

মহামহিম আল্লাহ্পাকের কার্যাবলী বড়ই রহস্যময়। কে বুঝিবে তাঁহার হেকমত। জনমানবহীন বিশাল মরুর বুকে বিবি হাজেরা রা.কে তিনি করিয়াছিলেন নির্বাসিতা। শিশু ইসমাইল আ. এর পবিত্র কদমের আঘাতে ধূসর মরুতে সৃষ্টি হইয়াছিল আবে জমজম-এর। ক্রমে সেখানে গড়িয়া উঠিল জন বসতি। হজরত ইব্রাহিম আ. সেখানে নতুন করিয়া ঘর বাঁধিলেন। পিতা-পুত্র মিলিয়া গড়িয়া তুলিলেন পবিত্র কাবা। পরবর্তী কালে তাঁহারই বংশে জন্ম নিলেন আল্লাহ্র হাবীব হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ্পাক রহমতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করিবেন বলিয়া বহু পূর্ব হইতেই ধূসর মক্কা আবাদ করিয়া রাখিলেন।

সেই হাবীবেপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতিবিম্ব শায়েখ আহমদ র. কে প্রেরণের পূর্বেও তেমনি জনমানবহীন সেরহিন্দের গভীর অরণ্যে আল্লাহ্পাক বসতির সূচনা করিলেন।

সেরহিন্দ পূর্বে ছিল গভীর অরণ্যাকীর্ণ। সেরহিন্দ শব্দের অর্থ 'বাঘের অরণ্য'। পূর্বে এই অরণ্য ছিল ব্যাঘ্রকূলের আবাসস্থল। তখন ছিল ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের রাজত্বকাল। বাদশাহ্র কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী শাহী খাজানা লইয়া লাহোর হইতে দিল্লীর দিকে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে রাত্রি হইল। সেরহিন্দের জঙ্গলের

পাশে তাঁহারা নিশিযাপন করিলেন। তাঁহাদের দলে একজন আহলে কাশফ্ বা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন দরবেশ ছিলেন। রাত্রিতে সেই ব্যক্তি দেখিতে পাইলেন, জঙ্গলের মধ্যে সর্বনিম্ন পাতাল হইতে আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিরাটকায় নূর! তিনি বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া গেলেন। দিল্লী পৌঁছিয়া তিনি বাদশাহ্‌র পীর হজরত মখদুম জাহানীয়া র.কে এই কথা জানাইলেন। হজরতের হৃদয়ে এই ঘটনা গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করিল। তিনি বাদশাহ্‌কে বলিলেন– 'আমাদের পীর মুরিদি সিলসিলায় ক্রমাগতভাবে এই মূল্যবান উপদেশ চলিয়া আসিতেছে যে, হজরত রসূলে করীম সাল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর তিরোধানের এক হাজার বছর পর হিন্দুস্তানে এক অদ্বিতীয় মর্যাদাসম্পন্ন অলি-আল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি জামানার সংস্কারক ও সর্দার হইবেন। বেলায়েত ও নবুয়তের সম্পদে তিনি পরিপূর্ণ হইবেন। পূর্ববর্তী অলিগণের সম্মিলিত কামালাত তিনি অর্জন করিবেন। জানিতে পরিলাম সেরহিন্দের গভীর অরণ্য তাঁহার আবির্ভাবস্থল। সেই স্থানে কিছু বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করিলে বড়ই উত্তম হইত।'

বাদশাহ্ এই বিষয়ে বড়ই আগ্রহান্বিত হইলেন। উজির ফত্‌হুল্লার উপর তিনি এই দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। উজির সাহেব কয়েক সহস্র লোক সঙ্গে লইয়া অরণ্যে আবাদী স্থাপনের জন্য রওয়ানা হইয়া গেলেন। একটি উচ্চ নিরাপদ স্থানে তিনি দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। দ্রুত নির্মাণকার্য আরম্ভ হইল। কিন্তু সবাই লক্ষ্য করিলেন এক অদ্ভুত ঘটনা। সারাদিন ধরিয়া যতটুকু নির্মিত হইত, রাত্রিতে উহার সবটুকু ধূলিসাৎ হইয়া যাইত। বহু অনুসন্ধান করা হইল। কিন্তু কোন কারণ জানা গেল না। অবশেষে এই অলৌকিক ঘটনা বাদশাহ্‌কে জানানো হইল। তিনি তাঁহার পীর হজরত মখদুম জাহানীয়া র.কে সমস্ত ঘটনা অবগত করাইলেন।

হজরত জাহানীয়া র. তাঁহার খাস খলিফা ইমাম রফিউদ্দিন র.কে ঘটনাস্থলে পাঠাইয়া দিলেন। ইমাম রফিউদ্দিন র. মোরাকাবা করিলেন। জানিতে পারিলেন, বাদশাহ্‌র লোকজন ভুল করিয়া শাহ বু-আলী কলন্দর র.কে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বিনা মজুরীতে শ্রমিকের কাজ করাইতেছে। তাই তিনি রাত্রিবেলা তাঁহার রূহানী শক্তি দ্বারা নির্মীয়মাণ ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন। হজরত রফিউদ্দিন র. তখন হজরত কলন্দর র. এর প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন পূর্বক এই দুঃখজনক ঘটনার জন্য মাফ চাহিলেন। কলন্দর সাহেব বলিলেন, 'আপনাকে এই স্থলে আনিবার জন্য আমি ইহা করিয়াছিলাম। এই শহরে হজরত নবীয়ে পাক সাল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর যে খাস প্রতিনিধি প্রেরিত হইবেন তিনি হইবেন আপনারই বংশধর। আমার বাসনা, আমরা দুজনে মিলিয়া এই শহরের ভিত্তি স্থাপন করি।'

অতঃপর উভয় বুজর্গ বিসমিল্লাহ্ বলিয়া দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই এক দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রস্তুত করা হইল। হিজরী ৭৬০ সনে এই দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল।

দুর্গ ও শহর স্থাপনের পর শহরটি তত্ত্বাবধানের ভার পড়িল ইমাম রফিউদ্দিন র. এর উপর। তাঁহার সহিত সাতাইশটি খাঁটি নসবসম্পন্ন কোরায়েশ পরিবারও সেখানে বসতি স্থাপন করিলেন। বাদশাহ্ তাঁহাকে বহু গ্রাম নেওয়াজ স্বরূপ প্রদান করিলেন। ক্রমে ক্রমে সেখানে বসবাস করিবার জন্য হাজার হাজার পাঠান ও মোঘল আগমন করিল। এমনিভাবে গভীর অরণ্যে মহা হেকমতময় আল্লাহ্পাক প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাঁহার প্রিয় বান্দা হজরত শায়েখ আহমদ র. এর জন্মভূমি সেরহিন্দ শরীফ। মদীনা শরীফের পরেই কায়েম হইল সেরহিন্দ শরীফের দরজা।

হজরত শায়েখ আহমদ র. ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর বিন খাত্তাব রা. এর বংশধর। তাঁহার নসবনামা সাতাইশ পুরুষে গিয়া আমিরুল মোমেনীন হজরত ওমর রা. এর সহিত মিলিত হইয়াছে।

হজরত ওমর রা. এর পুত্র বিখ্যাত সাহাবী হজরত আবদুল্লাহ রা. ইমাম হাসান রা. এর কন্যা ফাতেমা রা.কে বিবাহ করেন। তাঁহারই বংশে হজরত শায়েখ আহমদ র. এর জন্ম। সুতরাং দেখা যায়, তিনি ছিলেন পিতার দিক হইতে ফারূকী এবং মাতার দিক হইতে সৈয়দ।

তাঁহার ঊর্ধ্বতন বংশ তালিকা নিম্নরূপঃ-

১. হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি শায়েখ আহমদ ফারূকী সেরহিন্দি র.
২. হজরত মখদুম আবদুল আহাদ র.
৩. শায়েখ জয়নূল আবেদীন র.
৪. শায়েখ আবদুল হাই র.
৫. শায়েখ হাবীবুল্লাহ্ র.
৬. হজরত শায়েখ ইমাম রফিউদ্দিন র.
৭. শায়েখ নাসির উদ্দিন র.
৮. শায়েখ সোলায়মান র.
৯. শায়েখ ইউসুফ র.
১০. শায়েখ ইসহাক র.
১১. শায়েখ আবদুল্লাহ র.
১২. শায়েখ শোয়ায়েব র.
১৩. শায়েখ আহমদ র.
১৪. শায়েখ ইউসুফ র.
১৫. শায়েখ শেহাবুদ্দিন র.

১৬. শায়েখ নাসির উদ্দিন র.
১৭. শায়েখ মাহমুদ র.
১৮. শায়েখ সালমান র.
১৯. শায়েখ মাসউদ র.
২০. শায়েখ আবদুল্লাহ (ওয়ায়েজে আসগর) র.
২১. শায়েখ আবদুল্লাহ (ওয়ায়েজে আকবর) র.
২২. শায়েখ আবদুল ফাতাহ র.
২৩. শায়েখ ইসাহাক র.
২৪. শায়েখ ইব্রাহিম র.
২৫. শায়েখ নাসের র.
২৬. হজরত শায়েখ আবদুল্লাহ্ রা.
২৭. আমিরুল মোমেনীন হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.
২৮. নফীল
২৯. আবদুল ওজ্জা
৩০. বেরাহ
৩১. আবদুল্লাহ্
৩২. কোরত
৩৩. জেরাহ
৩৪. আদী
৩৫. কায়াব।

কায়াব এর বংশতালিকা চল্লিশ পুরুষে গিয়া আমাদের পিতা হজরত আদম আলায়হিস সালাম এর সহিত মিলিত হইয়াছে। হজরত ঈসা বিন মরিয়ম আ. এর আসমানে আরোহণের পঁচাত্তর বছর পরে ছিল কায়াবের জামানা। হাবীবেপাক হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর বংশও আট পুরুষে গিয়া কায়াবের সহিত মিলিত হইয়াছে। নিম্নে উহা দেওয়া হইলঃ

১. শফিউল মুজনেবিন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম
২. আবদুল্লাহ্
৩. মোত্তালেব
৪. হাসেম
৫. আবদে মানাফ
৬. কোসাই
৭. কেলাব
৮. মুররাহ বিন কায়াব।

শায়েখ আহমদ ফারূকী র. এর বংশের প্রত্যেক বুজর্গই ইমান ও হেদায়েতের সাম্রাজ্যের সিপাহ্সালার ছিলেন। তাঁহারা যেখানেই বসবাস করিয়াছেন, সেখানেই অযাচিতভাবে হেদায়েতের কিরণ ছড়াইয়াছেন। প্রয়োজনবোধে জেহাদ করিয়াছেন।

হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দোয়া করিয়াছিলেন 'ইয়া আল্লাহ্! ওমর বিন খাত্তাব দ্বারা দ্বীন ইসলামকে শক্তিশালী করুন।' বলা বাহুল্য তাঁহার এই দোয়া আল্লাহ্পাকের দরবারে মকবুল হইয়াছিল। হজরত ওমর রা. এর খেলাফতকালে দ্বীন ইসলামের কিরূপ চরম উন্নতি হইয়াছিল ইতিহাসে তাহার সাক্ষী মিলিবে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর খাস সহচর এই মহান খলিফার পরবর্তী বংশধরগণ বংশের গৌরব অটুট রাখিয়াছিলেন।

তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ্ রা. ছিলেন উচ্চমর্তবাসম্পন্ন সাহাবী। শায়েখ নাসের র. ও শায়েখ ইব্রাহিম র. ছিলেন তাবেঈন। শায়েখ ইসাহাক র. ছিলেন তাবে তাবেঈন। বিংশ পুরুষ শায়েখ আবদুল্লাহ্ র. (ওয়ায়েজে আসগর) পর্যন্ত এই বংশ হেজাজ প্রদেশে বাস করিতেছিলেন। আব্বাসীয় বংশের খলিফাগণের একান্ত অনুরোধে তাঁহার পুত্র শায়েখ মাসউদ র. রাজধানী বাগদাদে আসিয়া বসবাস শুরু করেন।

পঞ্চদশ পুরুষ শায়েখ শেহাবুদ্দিন র. ফররুখ শাহ্ কাবুলী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত বুজর্গ। মুসলিম শাসকগণের ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে তিনিও কাবুল হইতে আসিয়া ভারত আক্রমণ করেন। তিনি প্রথম সেখানে মূর্তির ঘর ধ্বংস করেন এবং মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি মূর্তিপূজকদিগকে অপদস্থ করেন এবং হত্যা করেন। ইহার পর তিনি ইরান, তুরান, বদখশান ও খোরাশান প্রভৃতি দেশ জয় করেন। কাবুলে তিনি মোঘল ও আফগানদের মধ্যে জমিদারী বণ্টন করিয়া দেন এবং সীমান্ত এলাকা সুদৃঢ় করেন। শেষ জীবনে তিনি রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া কাবুল শহরের নিকটে একটি ডেরায় বসিয়া আল্লাহ্তায়ালার ইবাদত বন্দেগীতে নিমজ্জিত হন। এখনও 'ডেরায়ে ফররুখ শাহ কাবুলী' তাঁহার পবিত্র স্মৃতি বহন করিতেছে।

ইহার পর তাঁহার সাহেবজাদা শায়েখ আবু ইউসুফ র. পিতার প্রতিনিধি হইলেন। তিনিও শেষকালে পার্থিব শান শওকতের মোহ ত্যাগ করিয়া নির্জন বাস অবলম্বন করেন।

পরবর্তীকালে তাঁহার পুত্র শায়েখ শেহাবুদ্দিন র. গদ্দিনশীন হন। তারপর তাঁহার পুত্র শায়েখ আবদুল্লাহ র. খেলাফত লাভ করিলেন। এইভাবে ক্রমাগত সেরহিন্দ শরীফের প্রতিষ্ঠাতা হজরত ইমাম রফিউদ্দিন র. পর্যন্ত খেলাফত পৌঁছিল।

ইমাম রফিউদ্দিন র. এলমে বাতেন ও এলমে জাহেরে একজন পরিপূর্ণ বুজর্গ ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার পূর্ণ খলিফা ছিলেন। ইহা ছাড়াও অনেক বড় বড় বুজর্গ হইতে তিনি ফায়দা হাসিল করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি হজরত সৈয়দ জালালুদ্দিন র. হইতে খেলাফত লাভ করেন। তিনি তাঁহাকে ইমাম নির্বাচিত করিয়াছিলেন।

হজরত শায়েখ আহমদ র. রসুলেপাক সাল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর মতো খতনা অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি সাধারণ শিশুদের মতো কাঁদিতেন না। তাঁহার শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদ কখনও অপবিত্র হইত না।

শৈশবকালে একবার তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শায়েখ আবদুল আহাদ র. হজরত শাহ কামাল কায়থলী র.কে তাঁহার উপর দম ও দোয়া করিবার জন্য ডাকিয়া আনিলেন। হজরত শাহ কামাল র. তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'আল্লাহ্‌পাক এই শিশুর হায়াত দারাজ করুন। ইনি একজন খাঁটি আলেম, আমেল ও আরেফে কামেল হইবেন। আমাদের মতো বুজর্গগণ তাঁহার কোলে প্রতিপালিত হইবে ও অশেষ উপকার লাভ করিবে। কেয়ামত পর্যন্ত তাঁহার নূর সমুজ্জ্বল থাকিবে। বহু অলিআল্লাহ্‌ তাঁহার আবির্ভাবের সুসংবাদ দিয়া গিয়াছেন। বহু বুজর্গ তাঁহার প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া আছেন।'

অবশেষে হজরত কায়থলী র. স্নেহবশতঃ তাঁহার মোবারক জিহ্বা শিশু শায়েখ আহমদের পবিত্র মুখে প্রবেশ করাইলেন। শায়েখ আহমদ র. তাঁহার জিহ্বা সজোরে চুষিতে আরম্ভ করিলেন। তখন শাহ্‌ সাহেব বলিলেন, 'এই মোবারক শিশু এবার কাদেরীয়া তরিকার সমস্ত কামালত হাসিল করিলেন।'

কালের চক্র আবর্তিত হইতে লাগিল। শায়েখ আহমদ র. বিদ্যা শিক্ষা করিবার বয়সে উপনীত হইলেন। গারে হেরায় যে জ্ঞানের চর্চা শুরু হইয়াছিল, সেই জ্ঞান আহরণের দিকে তিনি মনোনিবেশ করিলেন। সর্বপ্রথমে তিনি কোরআনুল করিম হেফজ করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি পূর্ণ হাফেজ হইয়া গেলেন।

ইহার পর তিনি অন্যান্য জরুরী কেতাবসমূহ পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। শিয়ালকোটের বিশিষ্ট আলেম মওলানা কামাল উদ্দিনের নিকট তিনি জ্ঞানগর্ভ

কেতাব ও এলমে মানতেকের জটিল কেতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। কাজী বহলুল বদখ্‌শানীর নিকট হইতে তিনি তফসীরে ওয়াহেদী, তফসীরে বায়জাবী ও অন্যান্য কেতাবসমূহ, সহিহ বোখারী, মেশকাত, তিরমিজি শরীফ, শামায়েলে তিরমিজি, জামে সগির, কাসিদায়ে বুরদা প্রভৃতির এজাজত হাসিল করেন। কাশ্মীরের মোহাদ্দেস শায়েখ ইয়াকুব সাহেবকে হাদিসের কেতাবাদি শুনাইয়া তিনি সনদ লাভ করেন। চতুর্দিকে তাঁহার সুনাম ছড়াইয়া পড়িল যে, তিনি মোহাদ্দেসের আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। মাত্র সতের বছর বয়সে শায়েখ আহমদ র. বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিলেন।

পুষ্পের কাজই হইতেছে সৌরভ ছড়ানো। তেমনি প্রকৃত এলমের কাজও হইতেছে চতুর্দিকে এলেম ও হেদায়েতের সৌরভ ছড়ানো। শায়েখ আহমদ র. শিক্ষাদান কার্য শুরু করিলেন। দেশ বিদেশের শিক্ষার্থীগণ দলে দলে আসিয়া ভিড় করিতে লাগিলেন। দিবারাত্রি শিক্ষাদান কার্য চলিতে লাগিল। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বহু লোক তাঁহার নিকট হইতে সনদ লাভ করিলেন।

শায়েখ আহমদ র. এর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন এলমে মারেফতের সাধক। এলমে মারেফত যেন তাঁহার বংশগত সম্পদ। তিনি অতঃপর মারেফত সাধনা আরম্ভ করিলেন। সর্বপ্রথমে তিনি তাঁহার বুজর্গ পিতার নিকট মুরিদ হইলেন। তাঁহার পিতা শায়েখ আবদুল আহাদ র. এর সংসর্গ ছিল স্পর্শমণিতুল্য। তিনি ছিলেন মারেফত জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

এখানে শায়েখ আবদুল আহাদ র. এর জীবন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। তিনি যৌবনকালে আল্লাহ্‌ প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া হজরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী র. এর নিকট গিয়া তাঁহার নিকট হইতে সুলুক শিক্ষার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তিনি তাঁহাকে উপদেশ দিয়া বলেন, সর্বপ্রথম এলমে শরীয়ত শিক্ষা করা প্রয়োজন। কারণ, বে-এলেম দরবেশের মধ্যে প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় না। সে নিমকহীন খাদ্যের মত স্বাদহীন।'

শায়েখ আহাদ র. আরজ করিলেন, 'জীবন সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই। উত্তরে হজরত গাঙ্গুহী র. বলিলেন, সে সময় এখনও অনেক দেরী। আল্লাহ্‌পাক আপনার দ্বারা এক মূল্যবান খেদমত উঠাইবেন। আপনার কপালে একজন মহান অলীর নূর জ্বলিতেছে। তাঁহার আবির্ভাবের বড়ই প্রয়োজন। যদি আল্লাহ্‌পাক তখন পর্যন্ত আমাকে হায়াতে রাখেন, তবে তাঁহাকে আল্লাহ্‌প্রাপ্তির অসিলা করিব।'

অতঃপর তিনি নিজের বার্ধ্যক্যের কথা স্মরণ করিয়া বলিলেন, 'যদি আপনার এলেম শিক্ষা সমাপ্ত হইবার আগেই আমি ইন্তেকাল করি, তবে আমার সাহেবজাদার নিকট হইতে সুলুক শিক্ষা করিবেন।'

শায়েখ আহাদ র. জাহেরী এলেম শিক্ষা শুরু করিলেন। কিন্তু শিক্ষা সমাপ্ত হইবার আগেই হজরত গাঙ্গুহী র. এর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তিনি বড়ই ব্যথিত ও অনুতপ্ত হইলেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি কয়েক বছর ধরিয়া বিভিন্ন দেশ সফর করিলেন। শেষে হজরত গাঙ্গুহী র. এর পুত্র শায়েখ রুকুনুদ্দিন র. এর নিকট গমন করিলেন। তিনি পিতার নির্দেশ মত শায়েখ আহাদ র. এর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক তাঁহাকে বাতেনী এলেমে ভরপুর করিয়া দিলেন। হিজরী ৯৭৯ সনে তিনি তাঁহাকে কাদেরীয়া ও চিশতিয়া সাবেরীয়া তরিকার খেরকা ও খেলাফত দান করেন। খেলাফতনামাটি বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় লিখিত ছিল।

ইহার পর তিনি শাহ কামাল কায়থলী কাদেরী র. এর খেদমতে থাকিয়া কাদেরীয়া তরিকার সুলুক শিক্ষা করেন। শাহ্ কামাল র. বড়ই জজবাওয়ালা ও উচ্চ কারামতসম্পন্ন অলি-আল্লাহ্ ছিলেন। আল্লাহ্ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তিনি দিবারাত্রি জঙ্গলে ও মাঠে-ময়দানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

অনেক সময় মরুভূমিতে উজ্জ্বল নয়নাভিরাম নগর দৃষ্টিগোচর হইত। নগরবাসীগণ সাদর সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইত এবং সমস্ত রাত্রি তাঁহার খেদমতে কাটাইয়া দিত। প্রভাতকালে অধিবাসীগণসহ নগর অদৃশ্য হইয়া যাইত। তিনি ৯৮১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। সেরহিন্দ শরীফ হইতে কিতল নামকস্থানে তাঁহার রওজা পাক অবস্থিত।

শায়েখ আবদুল আহাদ র. আরও অনেক মাশায়েখ হইতে ফায়দা হাসিল করিয়াছিলেন। তিনি কাবুল হইতে বাংলাদেশ পর্যন্ত সফর করেন। তাঁহার অনেক কারামত প্রকাশিত হইয়াছিল।

একসময় হঠাৎ এক ব্যক্তি তাঁহার হুজরা শরীফে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাঁহার হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রতঙ্গ বিক্ষিপ্ত ও ছিন্নভিন্নভাবে এখানে ওখানে পড়িয়া আছে। লোকটি ভয় পাইয়া গেল। বাহিরে গিয়া সে সবার নিকট উক্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া দিল। তখনই সবাই তাঁহার ঘরে গিয়া দেখিল, তিনি সুস্থ অবস্থায় তাঁহার আসনে জিকিরে মশগুল। পূর্বের ঘটনা বর্ণনা করিলে তিনি উহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

অনেক সময় কেহ কেহ তাঁহাকে বলিত— আমরা মক্কা শরীফে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। কেহবা বলিতেন— মদীনা মনওয়ারায় আমরা আপনাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম। আবার কেহ বলিতেন— বাগদাদ শরীফে আমরা আপনাকে দেখিয়াছি। উত্তরে তিনি বিনীতভাবে জানাইতেন— 'ভাই, ঐ সব স্থানে আমিতো কখনো যাই নাই।'

তিনি ছিলেন মূলতঃ শায়েখ আকবর র. এর মতবাদে বিশ্বাসী। 'আওয়ারেফুল মায়ারেফ', 'ফুছুছুল হাকাম', 'মাওয়াকেফুন্নজুম' প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ মারেফতের

কেতাবসমূহ তিনি অতি উত্তমরূপে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে পারিতেন। ‘ওয়াহ্‌দাতুল অজুদ’ এর বিষয়ে তিনি বলিতেন, ‘যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হয় তাহা সবই প্রকৃত পক্ষে ‘এক’। কেবল শিরোনাম বিভিন্ন।’

শায়েখ আহমদ র. বুজর্গ পিতার নিকট হইতে মারেফত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। মারেফতের জটিল বিষয়সমূহ তিনি অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন। ওয়াহ্‌দাতুল অজুদের যাবতীয় অলি গলি অতি অল্প দিনেই তাঁহার নিকট দিবালোকের মতো পরিষ্কার হইয়া গেল।

একদিন তিনি পিতা ও মোর্শেদ শায়েখ আহাদ র.কে প্রশ্ন করিলেন, ‘একিনের প্রকৃত অর্থ কি?’

পিতা উত্তর দিলেন, ‘এক হওয়া’। অর্থাৎ দর্শক ও দর্শিতের মধ্যে কোনরূপ দ্বিত্বভাব যেন অবশিষ্ট না থাকে। এ বিষয়ে আবদুল্লাহ্ বদায়ুনি সোহ্‌রাওয়ার্দি র. বর্ণনা করিয়াছেন–

হাকিকত জুজ্ খোদা দিদান রওয়া নিস্ত।
কে বেশখ্ দর দো-আলম জুজ্ খোদানিস্ত।
নমী গুয়েম কে আলম উ শোদা নাহ্,
কেই নেসবত বাউ করদান সওয়া নিস্ত।
নাউ আলম শোদ অন্নেয় আলম উ শোদ,
হামারা ই চুঁনী দিদান খাতা নিস্ত।

হকীকতে আল্লাহ্ ছাড়া কেহই নাই
খোদা ব্যতীত দোজাহানে কিছুই নাই
‘খালেক মখলুক সবকিছুই একাকার’
এ কথা অবশ্য আমি বলি নাই
তিনি নন সৃষ্টি– সৃষ্টি নয় তিনি
কিন্তু, এরূপ এক দেখাতে দোষ নাই।

ইবাদত ও জিকিরের কঠোর সাধনার ফলে এবং আল্লাহ্‌পাকের খাস রহমতে শায়েখ আহমদ র. অতি অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার পিতার নিকট হইতে একে একে পনেরটি তরিকার খেলাফত হাসিল করিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার পিতা শাহ কামাল কায়থলী র. এর নিকট হইতে যে ফরদিয়াতের নেসবত হাসিল করিয়াছিলেন তাহাও তিনি লাভ করিলেন।

শিক্ষা সমাপ্ত হইল। ইহার পর আর কি? আরও আছে। মারেফতের অলি গলি চেনা হইল। কিন্তু রাজপথ অজ্ঞাত রহিল। বৃত্ত দেখা হইল– কিন্তু বৃত্তের কেন্দ্র

রহিল অজানা। অধিকতর উচ্চ সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম মারেফতসমূহ যে নকশ্‌বন্দিয়া আউলিয়া বুজর্গগণের হাতে আছে। কিন্তু উপায় নাই। এদেশে কোন নকশ্‌বন্দি বুজর্গ নাই। তাই তাঁহাদের তরিকা হইতে উপকার পাওয়ার কোন সুযোগ নাই।

শায়েখ আহমদ র. উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে পিতার নিকট জানিতে পারিলেন। তিনি প্রায়ই নক্‌শবন্দিয়া তরিকার শিক্ষা না পাইবার কারণে তাঁহার পিতাকে আফসোস করিতে শুনিতেন। তাঁহার নিজের হৃদয়েও নকশ্‌বন্দিয়া তরিকা সম্পর্কে জানিবার আগ্রহ দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল।

দিন যাইতে লাগিল। শায়েখ আহমদ র. পরিপূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মশহুর সুন্নত পালন করিবার সময় আসিল। তাঁহার বিবাহের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু হইল।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর খাস নায়েবের শাদী মোবারক প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই স. নির্দেশে সম্পন্ন হইল। তিনিই দুলহান নির্বাচিত করিয়া দিলেন।

থানেশ্বরের শাসনকর্তা শায়েখ সুলতানকে তিনি পর পর তিনবার শায়েখ আহমদ র. এর সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবার নির্দেশ দিলেন। শায়েখ আহমদ র. এর নিকট পয়গাম আসিল। তাঁহার পিতার অনুমতিক্রমে একবার পিতা-পুত্র আকবরাবাদ হইতে সেরহিন্দ শরীফে আসিবার সময় শাদী মোবারক সম্পন্ন হইল।

তাঁহার স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত পুণ্যবতী মহিলা। বিবাহের পর শায়েখ আহমদ র. এর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হইতে শুরু করিল। তিনি বসবাসের জন্য নতুন একটি বাড়ী প্রস্তুত করিলেন।

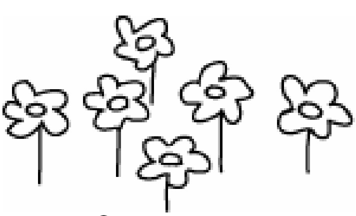

মানবজীবনে মৃত্যু এক চিরন্তন সত্য। হজরত আদম আ. হইতে শুরু করিয়া যাহারা পৃথিবীতে আসিয়াছে সবাইকে পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ভবিষ্যতে যাহারা আসিবে তাহাদেরকেও যাইতে হইবে। চিরঞ্জীব কেবল আল্লাহ্‌পাক। মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

নবী আ. ও অলিআল্লাহ্ র. গণের জীবনে মৃত্যুর স্বাদ অন্যরূপ। মৃত্যু তাঁহাদের নিকট রফিকে আলার সহিত মিলনের আহ্বান। যে প্রেমাম্পদের জন্য সমস্ত জীবন তাঁহারা বিরহ যন্ত্রণায় জ্বলেন– মৃত্যু সেই বিরহ যন্ত্রণার অবসান ঘটায়। মৃত্যু আসিলে তাই তাঁহাদের অন্তর প্রফুল্ল হইয়া ওঠে। প্রেমাম্পদের সহিত মিলনের আবেগে সমস্ত সত্তা আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

শায়েখ আহমদ র. এর বুজর্গ পিতা শায়েখ আব্দুল আহাদ র. এর জীবনেও মৃত্যুর আহবান আসিল। দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইল। অন্তরে অব্যক্ত আবেগ অবর্ণনীয় সুরে বাজিতে লাগিল। তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন। কয়েকবার বলিলেন, 'প্রকৃত কথা উহাই যাহা আমার পীর হজরত আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী র. বলিয়াছেন।'

শায়েখ আহমদ র. পাশেই ছিলেন। তিনি সওয়াল করিলেন, 'হুজুর উহা কি?'

তিনি বলিলেন, 'প্রকৃত পক্ষে হক সোবহানাহু তায়ালাই নিছক অস্তিত্ব। কিন্তু তিনি জগতের আবরণ বান্দাগণের দৃষ্টি সম্মুখে ঝুলাইয়া তাহাদিগকে দূরবর্তী করিয়া রাখিয়াছেন।

হাকীকত জুজ্ খোদা দিদান রওয়া নিস্ত
কে বেশখ দর দো আলম জুজ্ খোদা নিস্ত
শায়েখ আহমদ র. আরজ করিলেন, 'আমাকে অসিয়ত করুন।'

তিনি বলিলেন, 'বাস। এতটুকুই অসিয়ত। এখন আহলে বায়েতের মহব্বতে আমার সমস্ত সত্তা নিমজ্জিত। নেয়ামতের মহাসমুদ্রে আমি হাবুডুবু খাইতেছি।'

এলাহী বহক্কে বনি ফাতেমা
কে বর কওলে ইমাঁ কুনি খাতেমা।
বনি ফাতেমার বরকতে ইয়া এলাহী
তোমার কাছে ইমানে-খাতেমা চাহি।

১০০৭ হিজরীর সতেরই রজব আশি বৎসর বয়সে তিনি পরম বন্ধুর সহিত মিলিত হইলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

হজরত বাকী বিল্লাহ্ র. হিন্দুস্তান অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। মোর্শেদের হুকুম। তদুপরি ইমামুত্তরিকত হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশ্‌বন্দ র. এর নির্দেশ। হিন্দুস্তানে এই উচ্চ তরিকার প্রচলন হইবে। সেখানে একজন মোজাদ্দেদ আবির্ভূত হইবেন। তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিতে হইবে নেসবতে সিদ্দিকীর আমানত। তিনি এই নেসবতের ওয়ারেছ। হজরত সিদ্দিকে আকবর রাদিআল্লাহ্ আনহু হইতে ক্রমাগত এই আমানত চলিয়া আসিতেছে। ইহা তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিতেই হইবে। সেই মহান মোজাদ্দেদ এর মাধ্যমে নেসবতে সিদ্দিকীর নূর পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া দো-জাহান আলোকিত করিয়া তুলিবে। সুতরাং তাঁহার নিকট এই পবিত্র আমানত পৌঁছাইয়া দিবার দায়িত্ব হজরত বাকী বিল্লাহ্ র. এর উপর ন্যস্ত হইল।

তিনি প্রথমে এই কাজে নিজের অযোগ্যতার কথা স্মরণ করিয়া বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বহু আজিজি ইনকেছারীর সহিত এই মহান কাজ সম্পাদন করিবার ব্যাপারে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পীরে কেবলা হজরত খওজগী আমকাংগী র. ইহাতে রাজী হন নাই। বলিয়াছিলেন এই ব্যাপারে এস্তেখারা করিতে।

তিনি পীরের এরশাদ অনুযায়ী এস্তেখারা করিলেন। অদ্ভুত এক দৃশ্য তাঁহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, একটি গাছের ডালে একটি তোতা পাখি বসিয়া আছে। তোতাটি বড়ই সুন্দর। তোতার সৌন্দর্য দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। ভাবিলেন তোতাটি যদি তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িত– তবে এই গুরুত্বপূর্ণ সফর সফল ও আরামদায়ক হইত। এই কথা তাঁহার মনে আসিবা মাত্রই তোতাটি তাঁহার হাতে আসিয়া বসিল। তিনি সোহাগভরে তোতার মুখে নিজের জিহ্বার লালা ঢালিয়া দিলেন। তোতা তাঁহার মুখ চিনি দিয়া ভরিয়া দিল।

এই ঘটনা পীর কেবলা র. এর নিকট আরজ করিলে তিনি বলিলেন, ‘তোতা হিন্দুস্তানের পাখী। সেখানে তোমার প্রতিপালনে এমন এক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটিবে যাঁহার নূরে তামাম জাহান আলোকিত হইবে। তুমিও তাঁহার নিকট হইতে অনেক উপকার প্রাপ্ত হইবে।’

কাবুল ছিল হজরত বাকী বিল্লাহ্ র. এর জন্মস্থান। আল্লাহ্ প্রেমের আগুনে তিনি শৈশবকাল হইতে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইতেন। আল্লাহ্প্রাপ্তির আকাংখা সর্বদা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া রাখিত।

একদিন তিনি মারেফাতের একটি কেতাব মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার সম্মুখে একটি নূরের তাজাল্লি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি অত্যধিক পেরেশান হইয়া পড়িলেন। অনুভব করিলেন, হজরত খাজা বাহাউদ্দিন মোহাম্মদ নক্শবন্দ র. তাঁহাকে রূহানী তল্কীন ও জজ্বা প্রদান করিতেছেন।

এই ঘটনার পর হইতে তাঁহার পেরেশানি উত্তরোত্তর বাড়িতেই লাগিল। কামেল বুজুর্গের সন্ধানে তিনি উন্মাদপ্রায় হইয়া গেলেন। বদনের প্রফুল্লতা বিলীন হইয়া গেল। চরম বিমর্ষ অবস্থায় তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল।

তাঁহার মাতা হজরতের এই অবস্থা দেখিয়া বড়ই কাতর হইলেন। আল্লাহ্পাকের দরবারে মোনাজাত করিলেন, 'ইয়া এলাহী, তাহার মকছুদ পূর্ণ কর অথবা আমাকে মৃত্যু দান কর। পুত্রের এইরূপ অসহ্য পেরেশানি দেখিবার শক্তি আমার নাই।'

হজরত বাকী বিল্লাহ র. মোর্শেদের তালাশে বাহির হইলেন। মা ওরা উন্নাহার, বলখ, বদখশান, কাশ্মীর, লাহোর প্রভৃতি স্থানে তিনি সফর করিয়া বেড়াইলেন। একদিন তিনি খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহরার র.কে স্বপ্নে দেখিলেন। তিনি তাঁহাকে হজরত মাওলানা খওজগী আমকাংগী র. এর খেদমতে হাজির হইবার নির্দেশ দিলেন। পুনরায় হজরত খওজগী আমকাংগী র. স্বয়ং তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, 'হে ফরজন্দ! তোমার জন্য আমার হৃদয় ব্যথিত। চক্ষুদ্বয় দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ব্যাকুল।'

স্বপ্ন দেখিবার পর হজরতের অন্তর পুলকিত হইল। পেরেশানি দূর হইল। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর পথের দিশা মিলিয়াছে। বিশাল মরু অতিক্রম শেষে মরুদ্যানের সৌন্দর্য নয়ন শীতল করিয়া দিয়াছে।

অবশেষে কাটিল দীর্ঘ বিরহ রজনী-
ঝরিল শান্তির নীর, নিভিল অশনি।

হজরত বাকী বিল্লাহ্ র. হজরত মওলানা খওজগী আমকাংগী র. এর খেদমতে হাজির হইলেন। তিনি তিন দিন হজরত আমকাংগী র. এর সহিত নির্জনে কাটাইলেন। নিজের সমস্ত বাতেনী হালত মোর্শেদের নিকট পেশ করিলেন। শেষে হজরত আমকাংগী র. বলিলেন, 'আল্লাহ্পাকের রহমতে ও পূর্ববর্তী আউলিয়া কেরামের রূহানী তরবিয়তে আপনার কামালিয়ত সাফল্যের শেষ স্তরে উপনীত হইয়াছে। এখন আপনার কাজ হইল হিন্দুস্তান সফর করা। সেখানে আপনার মাধ্যমে এই উচ্চ তরিকা জারী হইবে।'

হজরত বাকী বিল্লাহ্ র. হিন্দুস্তান অভিমুখে চলিয়াছেন। লাহোর আসিয়া তিনি যাত্রা স্থগিত করিলেন। ক্রমে তাঁহার আগমন সংবাদ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তালেবে মাওলাগণ আসিয়া ভীড় করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে লাহোরের সমস্ত আলেম তাঁহার ভক্ত হইয়া উঠিলেন। এইভাবে এক বৎসর গত হইয়া গেল।

অতঃপর তিনি পুনরায় যাত্রা করিলেন। এইবার দিল্লী যাইতে হইবে। সেইখানেই হইবে নক্শবন্দি নূরের সার্থক প্রকাশ।

পথিমধ্যে সেরহিন্দ শরীফের নিকটে আসিয়া বিশ্রাম লইবার জন্য থামিলেন। তিনি অনুভব করিলেন এই স্থানটি যেন কিরূপ! রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি এক কুতুবের পাড়ায় অবস্থান করিতেছেন। প্রভাতে তিনি কুতুবের সন্ধানে শহরের নির্জনবাসী দরবেশগণের আস্তানায় আস্তানায় ঘুরিয়া বেড়াইলেন। কিন্তু কাহারও মধ্যে কুতুবিয়াতের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। পরে ভাবিলেন, হয়ত এখনও সেই কুতুবের প্রকাশে বিলম্ব রহিয়াছে।

পরদিন তিনি আরও এক স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন, তিনি একটি বৃহৎ প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিলেন। অনেক লোক সেই প্রদীপ হইতে নিজেদের প্রদীপ জ্বালাইয়া লইতে লাগিল। যখন তিনি সেরহিন্দ শরীফের কাছাকাছি গিয়া হাজির হইলেন– তখন দেখিলেন মাঠে ময়দানে এবং জঙ্গলে অসংখ্য প্রদীপ জ্বলিতেছে।

হজরত দিল্লী আসিয়া পৌঁছিলেন। ফিরজী কেল্লায় বসবাসের স্থান নির্বাচিত হইল। বাস করিবার জন্য তিনি খুবই ছোট এবং জরাজীর্ণ ঘর প্রস্তুত করিলেন। দুনিয়ার প্রতি বিন্দু পরিমাণ আসক্তিও তাঁহার মধ্যে ছিল না। তাঁহার মজলিশেও কেউ দুনিয়ার কোন আলাপ আলোচনা করিতে পারিত না।

ক্রমে ক্রমে নকশ্বন্দি কুসুমের সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত হইয়া উঠিল। মধুর সন্ধান পাইয়া মধুমক্ষিকাদের ভিড় বাড়িয়া গেল। অধিকাংশ মাশায়েখ ও পীরানে কেরাম পীর-মুরিদি ছাড়িয়া দিয়া হজরতের খেদমতে হাজির হইয়া নকশ্বন্দি নেয়ামত দ্বারা নিজেদেরকে সম্মানিত করিলেন। কোন কোন পীর ঈর্ষাবশতঃ নানাভাবে তাঁহার ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে বহু তাওয়াজ্জোহ ইসম প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হজরতের কোনই ক্ষতি করিতে পারিলেন না। বরং নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তাঁহারা হজরতের নিকট হাজির হইয়া বায়াত হাসিল করিয়া তাঁহার খাস দোস্তগণের

অন্তর্ভুক্ত হইতে লাগিলেন। হজরতের হেদায়েত ও ফয়েজ অতি দ্রুত সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

এত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে অতি নিকৃষ্ট মনে করিতেন। নিজের আমলের ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখা এবং আল্লাহ্‌পাকের রহমতের সম্মুখে নিজেকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে করা ছিল তাঁহার স্বভাব। কামাল ও তকমিলের দরজায় পৌঁছান সত্ত্বেও তিনি মারেফতে অজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। আল্লাহ্‌কে হাসিল করিতে না পারার জন্য তাঁহার আফসোসের অন্ত ছিল না।

হে আশেক সতর্ক থাকো আদবে লেহাজে–
আমৃত্যু সজ্জিত থাক সাধকের সাজে;
যদিওবা নাই-ই পাও সাফল্যের বারতা–
নীরবে নিশ্চিহ্ন হও-কহিও না কথা।

একবার তাঁহার এক মুরিদ তাঁহাদের এক দুষ্ট প্রতিবেশীকে পুলিশে ধরাইয়া দিলেন। হজরত শুনিয়া তাহাকে তিরস্কার করিলেন। মুরীদ আরজ করিলেন, 'হুজুর সে লোক বড় দুষ্ট ও ফাসেক।'

মুরীদের জবাব শুনিয়া হজরত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আহ্– আপনি বুঝি নিজেকে বে-গোনাহ্ ও সৎ মনে করেন? তাইতো অপরকে ফাসেক ও দুষ্ট দেখিতেছেন। কিন্তু আমি যে নিরুপায়। আমিতো আমার জাত হইতে অন্য কাহাকেও নিকৃষ্ট দেখিতে পাইতেছি না।'

হজরত ছিলেন ক্ষীণকায় ও দুর্বল। কিন্তু শারীরিক দুর্বলতা তাঁহার জিকির-আজকার, ইবাদৎ-বন্দেগী এবং রেয়াজতের ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করিতে পারিত না। এশার নামাজের পর তিনি হুজরায় গিয়া মোরাকাবায় বসিতেন। দুর্বলতা অনুভূত হইলে অজু করিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া লইতেন। তারপর পুনরায় মোরাকাবায় বসিতেন। এইভাবে এই মহান নকশবন্দি আশেকের সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইত।

মহব্বতের নজরে হজরত যদি কাহারও প্রতি তাওয়াজ্জোহ দিতেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার দিল রওশন হইয়া যাইত। তাঁহার মোবারক তাওয়াজ্জোহ-এর বদৌলতে কখনও কখনও প্রথম দেখাতেই কাহারও কাহারও সম্মুখে আলমে মেসাল (উদাহরণ জগত) এবং কাহারও সম্মুখে আলমে আরওয়াহ (রূহ এর জগত)- এর দৃশ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িত। আবার কেহ কেহ তাঁহার মোবারক চেহারা দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ্‌পাকের ইশকে মজজুব হইয়া যাইতেন।

অবাক প্রেমিকজন নকশ্‌বন্দিগণ,
মৃত্তিকা হইতে করেন কুসুম চয়ন।

বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ ও রসুলুল্লহ্ স. এর রওজা মোবারক জেয়ারতের বাসনা বহুদিন হইতে শায়েখ আহমদ র. এর হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া রাখিত। কিন্তু উপায় ছিল না। বৃদ্ধ পিতার শারীরিক দুর্বলতা ও অসুস্থতা ছিল একমাত্র প্রতিবন্ধক। তাঁহার খেদমত করার হক ছিল তাঁহার উপরে বর্তমান। হৃদয়ের চরম অস্থিরতা সত্ত্বেও তাই তিনি মক্কা শরীফ ও মদীনা মনওয়ারা সফর স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পিতা ইন্তেকাল করিয়াছেন। এবার তিনি হজ করিবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। প্রথমে দিল্লী আসিলেন। মওলানা হাসান কাশ্মীরি র. ছিলেন তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু। শায়েখ আহমদ র. তাঁহার মেহমান হইলেন।

মাওলানা সাহেব তাঁহাকে জানাইলেন, দিল্লীতে একজন নক্শবন্দি বুজর্গের আগমন হইয়াছে। তিনি নকশ্বন্দিয়া তরিকার এক অমূল্য রত্ন। এইরূপ হাস্তি বর্তমান জামানায় দুর্লভ। দীর্ঘদিন রিয়াজত ও চিল্লাকশি দ্বারা যাহা হাসিল করা যায় না, তাঁহার এক তাওয়াজ্জোহ-এর বরকতে তাহা হাসিল হইয়া যায়।

শায়েখ আহমদ র. এর মরহুম আব্বাজানের কথা মনে পড়িয়া গেল। নকশ্বন্দিয়া তরিকা গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার কতই না ব্যাকুলতা ছিল। কিন্তু এই দেশে কোন নক্শবন্দি বুজর্গ না থাকায় নকশ্বন্দি শারাবান তহুরার আকণ্ঠ তৃষ্ণা লইয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইয়াছে।

মাওলানা সাহেবের কথা শুনিয়া তাঁহারও অন্তরে প্রবল আকাংখা হইল। তিনি হজরত বাকী বিল্লাহ্ র. এর খেদমতে হাজির হইলেন। অবাক হইয়া দেখিলেন, ক্ষীণকায় দুর্বল এই নকশবন্দি বুজর্গ এর চেহারা মোবারক। এ যেন জ্বলন্ত এক অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। আল্লাহ্পাকের এক বিরল নিদর্শন।

খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিয়াই চিনিলেন এই সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যাঁহার জন্য বহুদিন হইতে নেসবতে সিদ্দিকীর আমানত সিলসিলা মারফত চলিয়া আসিতেছে। এই সেই রসুলুল্লহ্ স. এর খাস প্রতিনিধি যাঁহার জন্য তাঁহাকে হিন্দুস্তানে আগমন করিতে হইয়াছে।

কাহারও প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা ছিল হজরত খাজা র. এর স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ। কিন্তু তিনি শায়েখ আহমদ র. এর ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, 'আপনি আমার খানকায় কিছুদিন অবস্থান করুন।'

শায়েখ আহমদ র. এক সপ্তাহ অবস্থান করিবার ওয়াদা করিলেন। দুই দিন অতিবাহিত না হইতেই তাঁহার হালত পরিবর্তন হইল। হজরত খাজা র. এর জজবা দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হইতে লাগিলেন। নকশবন্দিয়া তরিকা গ্রহণের আকাংখা তাঁহার দিলে চরমভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করিল। তিনি হজরত খাজা র. এর হাতে বায়াত হইবার আরজি জানাইলেন।

হজরত খাজা র. কোনরূপ এস্তেখারা করিলেন না। তিনি শায়েখ আহমদ র.কে নিভৃত স্থানে ডাকিয়া লইলেন এবং তাঁহাকে মুরিদ করিলেন। প্রথমে তিনি তাঁহাকে কলবের জিকিরের তালিম দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার কলব নকশবন্দি নূরে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পূর্ণ লজ্জত ও আরামের মধ্য দিয়া তিনি কলবের তালিম সমাপ্ত করিলেন। সত্যিই নকশবন্দি বুজর্গগণ আল্লাহ্পাকের খাস নেয়ামতই বটে। নতুন নেসবতের অবর্ণনীয় আস্বাদে শায়েখ আহমদ র. হতবাক হইয়া গেলেন।

বিস্ময়কর সৃষ্টি তোমার নকশবন্দিগণ,
অবাক নিয়মে নূর করে বিকীরণ,
প্রেমের সৌরভ বিলান অযাচিত করে
এমন দয়ালু যে গো নাই চরাচরে,
কোথায় পাবে গো তুমি আপন এমন
যেমন আপনজন নকশবন্দিগণ।

শায়েখ আহমদ র. দিন দিন আধ্যাত্মিক সোপানসমূহ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। সপ্তাহ কাটিয়া গেল। কিন্তু তিনি আর যাইতে পারিলেন না। একদিন তিনি ফানা অবস্থায় দেখিতে পাইলেন এক বিশাল মহাসমুদ্র। উহার ছায়ার মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রকার চিত্র ও সুরত প্রকাশিত হইল। ক্রমে ক্রমে এই হাল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কোন কোন সময় এক প্রহর– কোন কোন সময় দুই প্রহর– আবার কোন কোন সময় সমস্ত রাত্রিব্যাপী এই অবস্থা স্থায়ী হইতে লাগিল। হজরত খাজা র. এর নিকট তিনি এই হাল বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন, 'আপনার এক ধরনের বিশেষ ফানা হাসিল হইয়াছে।'

ইহার পর তিনি তাঁহাকে জিকির করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। বলিলেন, 'শুধু জিকিরের প্রতি খেয়াল রাখুন।' দুই দিন চলিয়া গেল। শায়েখ আহমদ র. এবার 'ফানায় মোছতালেহ্' (প্রচলিত ফানা) লাভ করিলেন। হজরত খাজা র. এর নিকট এই হাল বর্ণনা করিলে তিনি এরশাদ করিলেন, 'তামাম আলম কি আপনার একক ও সংলগ্ন দৃষ্টিগোচর হইতেছে?'

শায়েখ আহমদ র. বলিলেন, 'একক দেখিতেছি।'

হজরত খাজা র. বলিলেন, 'ইহার নাম ফানা ফিল ফানা। কারণ, শরীরের সহিত সংলগ্ন থাকা সত্ত্বেও এই ফানা হাসিল হয়।'

সমস্ত রাত্রি তাঁহার এইরূপ অবস্থার মধ্যে কাটিল। পরদিন তিনি সমস্ত ঘটনা হজরত খাজা র. এর নিকট আরজ করিলেন এবং বলিলেন, 'আমি হক সুবহানাহু তায়ালার সম্পর্কের হুজুরী অনুভব করিতেছি।'

ইহার পর একটি কৃষ্ণবর্ণের নূর প্রকাশিত হইল। ইহা সমস্ত জগতকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। শায়েখ আহমদ র. এই অবস্থা হজরত খাজা র.এর নিকট পেশ করিলে তিনি এরশাদ করিলেন, 'ঐ কৃষ্ণ নূরের প্রশস্ততাই 'এলমে এলাহী।' উহা জাত পাকের সম্পর্কের মাধ্যমে জাগতিক দ্রব্য সামগ্রীর সহিত সুবিস্তৃত। ঐ বিস্তৃতিকে নফি করিতে হইবে।' অতঃপর উক্ত নূর সংকুচিত হইতে লাগিল। ক্রমাগত সংকুচিত হইতে হইতে উহা একটি বিন্দুতে পরিণত হইল।

হজরত খাজা র. বলিলেন, 'ঐ বিন্দুকেও নফি করিতে হইবে এবং হয়রানিতে আসিতে হইবে।'

শায়েখ আহমদ র. তাহাই করিলেন।

বিন্দু বিলুপ্ত হইল। হয়রানিও প্রকাশিত হইল। এইখানে তৌহিদে শুহুদি নসিব হয়। কেননা এই মাকামে হক সোবহানাহু তায়ালা নিজেই নিজেকে দেখেন।

তিনি এই হাল মোর্শেদের নিকট আরজ করিলেন। হজরত খাজা র. বলিলেন, 'ইহাই নকশবন্দিয়া হুজুরী'। নকশবন্দিগণ ইহাকে হুজুরে আগাহী বা হুজুরে বেগাইবত বলেন। ইহাই শেষ বস্তু প্রারম্ভে প্রবিষ্ট করনের মাকাম। এই তরিকায় ইহা গ্রহণ করা মাত্রই হাসিল হয়। কিন্তু অন্য তরিকায় যদি কাহারও কিছু লাভ হয় তবে তাহার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম ও সাধনার প্রয়োজন পড়ে। শায়েখ আহমদ র. ইহা মাত্র দুই মাস কয়েকদিনের মধ্যে হাসিল করিলেন।

অতঃপর পুনরায় ফানা শুরু হইল। ইহাই প্রকৃত ফানা। এইখানে কলব্ এত বেশী প্রশস্ততা লাভ করিল যে, সমগ্র আলম আরশ হইতে ফরশ সরিষার দানার মত নজরে আসিল। তিনি নিজেকে এবং জগতের প্রত্যেক বস্তুকে, প্রতিটি বিন্দুকে 'হক' দেখিলেন। ইহার পর বিশ্বের প্রত্যেক অণু পরমাণুকে নিজের প্রতিবিম্ব এবং নিজেকে এই সবের প্রতিচ্ছবি মনে হইতে লাগিল। ইহার পর নিজেকে বরং প্রত্যেক অনু পরমাণুকে এত বেশী প্রশস্ত দেখিলেন যে, শুধু সমস্ত বিশ্ব নয় বরং কয়েকগুণ বিশ্ব ইহার মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারে। যেন নিজেকে বরং প্রত্যেক অণু পরমাণুকে এমন বিস্তৃত নূর রূপে দেখিলেন যাহা অণু পরমাণুতে অনুপ্রবেশ করিল এবং বিশ্বের আকৃতি ও সুরত সমূহ এই নূরের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। ইহার পর নিজেকে এবং প্রতিটি অণু পরমাণুকে বিশ্বের শক্তির আধার অনুভূত হইল।

হজরত খাজা র. এর নিকট এই হাল ব্যক্ত করিলে তিনি বলিলেন, 'ইহা তাওহীদে হক্কুল ইয়াকিন।' অর্থাৎ ইহা হইল জময়ুল জমআ। ইহার পর বিশ্বের আকৃতিগুলি যাহা প্রথমে 'হক' মনে হইতেছিল তাহা নিছক কল্পনা বলিয়া পরিদৃষ্ট হইল। ইহাতে তাঁহার পেরেশানি অত্যধিক বাড়িয়া গেল। তাঁহার 'ফুছুছুল হাকাম' কেতাবের কথা মনে পড়িল। বুজর্গ পিতার নিকট উক্ত কেতাবের বিষয়ে তিনি শুনিয়াছিলেন, 'যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে বলিতে পার 'আলম হক'– অথবা বলিতে পার 'উহা সৃষ্ট।' ইহাও বলিতে পার এক হিসাবে উহা হক– অন্য হিসাবে উহা সৃষ্ট। অথবা উভয়কে পৃথক কর ইহাই উত্তম মর্যাদা।'

হজরত খাজা র. এর নিকট তিনি নিজের হাল বর্ণনা করিলেন। হাল শুনিয়া তিনি উত্তর দিলেন, 'এখনও আপনার হাল পরিচ্ছন্ন হয় নাই। বাস্তব ও অবাস্তবের মধ্যে পার্থক্য করিবার শক্তি হাসিল না হওয়া পর্যন্ত আপনি আপনার কার্যে রত থাকুন।'

শায়েখ আহমদ র. এই বিষয়ে 'ফুছুছুল হাকাম 'কেতাবের উদ্বৃতি শোনাইলেন। হজরত খাজা র. উহা শুনিয়া বলিলেন, 'কেতাবের লেখক হজরত শায়েখ মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী র. যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রারম্ভিক অবস্থা। কামেল অবস্থা নয়।'

তিনি পুনরায় নিজ কার্যে রত হইলেন। পরম দয়ালু আল্লাহ্পাক হজরত খাজা র. এর তাওয়াজ্জোহ এর বরকতে দুই দিনের মধ্যে বাস্তব ও অবাস্তবের পার্থক্য দেখাইয়া দিলেন। তিনি মওজুদে হাকিকিকে কল্পনা হইতে পৃথক করিয়া ফেলিলেন এবং কাল্পনিক বস্তু হইতে উৎপন্ন সেফাত, কার্যাবলী ও লক্ষণাদিসমূহকে আল্লাহ্পাকের তরফ হইতে পাইলেন। ঐসব সেফাত ও কার্যাবলীও অলীক মনে হইল এবং প্রকাশ্যে মজুদ রহিল শুধুই মাত্র এক জাতপাক।

তিনি এই অবস্থা হজরত খাজা র.কে জানাইলেন। তিনি বলিলেন, 'ফরক বাদাল জমআ অর্থাৎ একত্রিত হইবার পর পৃথক হওয়া ইহাকেই বলে। এইখানেই সমাপ্তি। ইহাই পূর্ণ স্তর।

হজরত খাজা র. তাঁহার সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন, 'আপনার মধ্যে মাহবুবিয়াত ও মোরাদিয়াত এর নেসবত আছে। মুহিব্বিয়াত ও মুরিদিয়াত ব্যক্তিগণের তুলনায় এইরূপ নেসবতধারী ব্যক্তিগণ অনায়াসে সুলুকের সমস্ত স্তর অতিক্রম করিতে সক্ষম হন।'

হজরত খাজা র. শায়েখ আহমদ র. এর যোগ্যতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এক বন্ধুর নিকট তিনি শায়েখ আহমদ র. সম্পর্কে লিখিলেন–

'শায়েখ আহমদ সেরহিন্দ শরীফের একজন খ্যাতিমান বুজুর্গ। তিনি বিদ্বান ও বা-আমল আলেম। ফকির কয়েকদিন মাত্র তাঁহার সহবতে আছেন। ইহাতেই তিনি

বিস্ময়কর ও দুর্লভ অবস্থা লাভ করিয়াছেন। তিনি একটি বৃহৎ নূর যাহা একদিন সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে। আলহামদুলিল্লাহ। ফকিরের বিশ্বাস ও কামালত তাঁহার ভিতর স্থিতিবান হইয়াছে। তাঁহার কয়েকজন ভাই আছেন। সকলেই নেক ও বুজর্গ। তাঁহার সংসর্গে সব সময় কয়েকজন আলেম উপস্থিত থাকেন। তাঁহার সহবতের বরকতে তাঁহারাও অনেক বাতেনী ক্ষমতা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার একজন অল্প বয়স্ক সাহেবজাদা আছেন। তিনি আল্লাহ্পাকের গুঢ় তত্ত্বসমূহের সমষ্টি। আল্লাহ্পাক তাঁহার সেজর শরীফকে উত্তমরূপে লালন করুন। ফকিরগণের হৃদয় আল্লাহ্প্রাপ্তির দরওয়াজা।'

হজরত খাজা র. এর অন্যান্য মুরিদগণ তাঁহাদের জ্ঞান অনুযায়ী তাঁহার প্রতি পৃথক পৃথক আকিদা রাখিতেন এবং সেই অনুপাতে ফয়েজ পাইতেন। কিন্তু শায়েখ আহমদ র. এর আকিদা ছিল সর্বোচ্চ। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, রসুলুল্লাহ স. এর জামানা গত হইবার পর হজরত খাজা র. এর মত তরবিয়ত আর কাহারও নসিব হয় নাই।

তাঁহার মত বা-আদব কোন মুরিদ ছিলেন না। তাঁহার পীর ভাই শায়েখ তাজ সাম্ভলী র. এর দায়িত্ব ছিল সব মুরিদগণের হাল শুনিয়া হজরত খাজা র. এর নিকট জানানো। কিন্তু শায়েখ আহমদ র. ছিলেন ইহার ব্যতিক্রম। তাঁহার প্রতি হুকুম ছিল নিজের অবস্থা সরাসরি হজরত খাজা র. এর নিকট আরজ করার। কিন্তু তিনি আদব প্রদর্শনের জন্য অধিকাংশ সময় নীবর থাকিতেন।

হজরত খাজা র. একদিন তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনি নিজের অবস্থা বলিতে চান না কেন, কি চিন্তা করেন?'

শায়েখ আহমদ র. আরজ করিলেন, 'আমিই বা কি, আর আমার অবস্থাই বা কি হইবে, যে তাহা প্রকাশের যোগ্যতা রাখে।'

তিনি এরশাদ করিলেন 'যাহা ঘটিবে এখন হইতে তাহার সবকিছুই সঠিকভাবে আমার নিকট আরজ করিবেন।'

হঠাৎ একদিন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়া গেল। শায়েখ আহমদ র. কি মনে করিয়া শায়েখ তাজ র. এর দিকে খেয়াল করিলেন এবং তাওয়াজ্জোহ দিলেন। ফলে তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

হজরত খাজা র. শায়েখ আহমদ র.কে বারবার ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি সব খুলিয়া বলিলেন। সব শুনিয়া হজরত খাজা র. এর চেহারা মোবারক বিবর্ণরূপ ধারণ করিল। উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিগণের মুখেও কোন কথা নাই। দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া মহফিলে নীরবতা বিরাজ করিল।

শায়েখ আহমদ র. নকশবন্দিয়া তরিকার পূর্ণ কামালত হাসিল করিলেন। এক মোবারক সময়ে তাঁহার নিকট খেলাফতনামা প্রদান করা হইল। তাঁহার মত মাহবুব ও মোরাদ ব্যক্তির তরবিয়তের সুযোগ লাভের জন্য হজরত খাজা র. আল্লাহ্পাকের নিকট শোকরানা আদায় করিলেন। তিনি তাঁহার হালত ও কামালতের অনেক প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার জন্মভূমি সেরহিন্দ শরীফে যাইবার এরশাদ করিলেন।

আবার সেই সেরহিন্দ। সেই মায়াময় মোহময় জন্মভূমি সেরহিন্দ। শায়েখ আহমদ র. সেরহিন্দ শরীফে ফিরিয়া আসিলেন। সেরহিন্দের আলো, বাতাস, মাটি তাঁহাকে মোবারকবাদ জানাইল।

শায়েখ আহমদ র. এবার নতুন বেশে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছেন। নেসবতে সিদ্দিকীর নূরে তাঁহার সর্বাঙ্গ সমুজ্জ্বল। মোর্শেদের এরশাদ নেসবতে সিদ্দিকীর এই নূর দিকে দিকে ছড়াইয়া দিতে হইবে। আল্লাহ্পাকের বান্দাগণকে হেদায়েতের পথের সন্ধান দিতে হইবে। ইহা যে এক পবিত্র দায়িত্ব। তিনি দায়িত্ব পালনে তৎপর হইলেন।

চতুর্দিক হইতে দলে দলে তালেবে এলেমগণ তাঁহার খেদমতে হাজির হইতে লাগিলেন। আল্লাহ্পাক কর্তৃক প্রদত্ত খাস রূহানী শক্তির সাহায্যে তিনি শত শত তালেবে এলেমকে কামালিয়তের স্তরে পৌঁছাইয়া দিলেন।

কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়া তাঁহার সময় কাটিতেছিল। সহসা অন্তর আলোড়িত হইল। কতদিন হইল মোর্শেদের পবিত্র সুরত দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। রূহানী নৈকট্য থাকিলে কি হইবে। সুরত যে সুরতকে দেখিবার জন্য উন্মাদ হয়। আহা কতদিন হইল। মোর্শেদ দর্শনের আকাংখা যে তীব্ররূপ ধারণ করিয়াছে। শায়েখ আহমদ র. দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

হজরত খাজা র. সংবাদ পাইলেন, তাঁহার নয়নের নূর তরিকা রেওয়াজকারী প্রিয়তম খলিফা দিল্লী আসিতেছেন। তাঁহারও হৃদয় উতলা হইল। তিনি সমস্ত খাদেম ও সালেকগণকে সঙ্গে লইয়া শায়েখ আহমদ র.কে স্বাগতম জানাইবার

জন্য দিল্লীর কাবুলী দরওয়াজা পর্যন্ত গমন করিলেন। সেখান হইতে অতিশয় সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নিজ খানকায় ফিরিয়া আসিলেন।

এইবার শায়েখ আহমদ র. এর অন্যরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইতে লাগিল। তাঁহার প্রতি বিশেষ কামালতের ফয়েজ বর্ষিত হইতে লাগিল এবং উরুজ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। তাঁহার প্রতি যেসব বিচিত্র ও গুঢ় মারেফতের রহস্যাদি প্রকাশিত হইতে লাগিল তাহা দেখিয়া হজরত খাজা র. বিস্মিত হইলেন। তিনি আর ওস্তাদ রহিলেন না। শিষ্য হইলেন। হজরত শায়েখ আহমদ র. এর নিকট তিনি দুর্লভ মারেফতসমূহের বর্ণনা ছাত্রের মত গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

পরিস্থিতির পরিবর্তন দেখিয়া হজরত খাজা র. এর খলিফা ও মুরিদগণের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কেহ কেহ হজরত শায়েখ আহমদ র. এর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতে লাগিলেন। হজরত খাজা র. এর নিকট ইহা গোপন রহিল না। কুওতে বাতেনী দ্বারা তিনি সব কিছুই জানিতে পারিয়া তাঁহাদের উপর বড়ই রাগান্বিত হইলেন। এরশাদ করিলেন 'তোমরা যদি নিজেদের ইমান বাঁচাইতে চাও তবে হজরত শায়েখ আহমদ র. এর প্রতি উত্তম আকিদা রাখ এবং আদব প্রদর্শন কর। কারণ তিনি রূহানী জগতের এমন এক তেজস্কর সূর্য যাহার উদয়ে আমাদের মতো শত সহস্র নক্ষত্র জ্যোতিহীন হইয়া পড়িয়াছে। স্মরণ রাখ উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে যে চারজন শ্রেষ্ঠ আউলিয়া আছেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম।'

কখনও কখনও হজরত খাজা র. তাঁহার অধীনে নিজের সমস্ত খলিফা ও মুরিদসহ মোরাকাবায় বসিয়া ফয়েজ হাসিল করিতে লাগিলেন। আসিবার সময় বড়ই আদবের সহিত ফিরিয়া আসিতেন। কোনক্রমেই তাঁহার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেন না।

হজরত খাজা র. এর এইরূপ সম্মান প্রদর্শন দেখিয়া হজরত শায়েখ আহমদ র. বড়ই লজ্জিত হইতেন। একদিন তিনি অত্যন্ত আদব সহকারে হজরত খাজা র. এর নিকট আরজ করিলেন, 'এই নিকৃষ্ট গোলামের প্রতি হুজুর যেরূপ আদব ও সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন তাহাতে আমি বড়ই লজ্জিত ও অনুতপ্ত।'

হজরত খাজা র. জবাব দিলেন, 'আল্লাহ্পাকের নির্দেশ ভিন্ন আমি কিছুই করিতেছি না। গায়েব হইতে এইরূপ করিবার জন্য আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং আমি ইহা পালন করিতে বাধ্য।'

আদব প্রদর্শনের কি বিচিত্র প্রতিযোগিতা। দেখিয়া বিস্ময় জাগে। অন্তর শীতল হয়। যেখানে আল্লাহ্পাকের উদ্দেশ্যে সমস্ত সত্তা উৎসর্গীকৃত— সেইখানে এইরূপই হইয়া থাকে।

একদিন হজরত শায়েখ আহমদ র. তাঁহার নিজ হুজরায় নিদ্রামগ্ন। সেই সময় হজরত খাজা র. তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার হুজরায় গমন করিলেন। খাদেম হজরত শায়েখ আহমদ র.কে নিদ্রা হইতে জাগাইতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি নিষেধ করিলেন এবং দরওয়াজার বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

হজরত শায়েখ আহমদ র. গভীর নিদ্রায় মগ্ন। কিন্তু সহসা তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চৌকি হইতে অবতরণ করিয়া পেরেশান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাহিরে কে?'

উত্তর আসিল, 'ফকির মোহাম্মদ বাকী।'

উত্তর শুনিয়া তিনি তড়িৎ গতিতে হজরত খাজা র. এর খেদমতে হাজির হইলেন।

হজরত শায়েখ আহমদ র. এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময় আসিল। হজরত খাজা র. তাঁহার নিজস্ব যাবতীয় বাতেনী নেয়ামত ও কামালিয়ত তাঁহাকে দান করিলেন এবং এরশাদের তাজ তাঁহার মস্তক মোবারকে পরাইয়া দিলেন। হজরত খাজা র. এর নির্দেশে তাঁহার সমস্ত খফিলাগণের হেদায়েত ও মুরিদগণের তরবিয়তের ভারও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইল।

হজরত শায়েখ আহমদ র. পুনরায় সেরহিন্দ শরীফে প্রত্যাবর্তন করিয়া সালেকগণের তালীম ও তরবিয়তের কার্যে মশগুল হইলেন। দীর্ঘদিন যাবত তিনি এই কার্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখিলেন। শত সহস্র সালেক তাঁহার স্পর্শমণি তুল্য সহবতের বরকতে ফয়ুজাত হাসিল করিতে লাগিলেন।

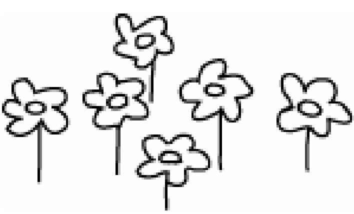

রবিউল আউয়াল মাসের ১০ তারিখ। শুক্রবার। হিজরী ১০১০ সাল। সোবহে সাদেকের পবিত্রতার বন্যায় সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত। সোবহে সাদেকের এমনরূপ বহুদিন ধরিয়া প্রকাশিত হয় নাই। হাজার বছর পূর্বের সুশৃঙ্খলতা ও পবিত্রতার চিহ্ন যেন সে আজ সর্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছে।

হজরত শায়েখ আহমদ র. নির্জন কক্ষে উপবিষ্ট। এমন সময় রসুলুল্লাহ্ স. তশরীফ আনিলেন। সঙ্গে সমস্ত আম্বিয়া আ. অসংখ্য ফেরেস্তা ও আউলিয়ায়ে

কেরাম। রসূলুল্লাহ স. তাঁহার পবিত্র হস্তে হজরত শায়েখ আহমদ র.কে একটি অমূল্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পোশাক পরাইয়া দিয়া বলিলেন, 'শায়েখ আহমদ, মোজাদ্দেদ এর প্রতীক স্বরূপ এই বিশেষ 'খিলআত' তোমাকে পরিধান করাইয়া দেওয়া হইল। এখন হইতে তুমি মোজাদ্দেদে আলফে সানি অর্থাৎ দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক। আমার উম্মতের দীন ও দুনিয়ার যাবতীয় দায়িত্ব আজ হইতে তোমার উপর অর্পিত হইল।'

সাধারণতঃ পয়গম্বর আ.গণ চল্লিশ বৎসর বয়সে নবুওয়তের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। হজরত শায়েখ আহমদ র. এর বয়স চল্লিশ বৎসর হইয়াছে। চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি 'মোজাদ্দেদে আলফেসানি' এর দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

হজরত গাউসে আজম মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী র. পাঁচশত বৎসর পূর্বে মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর আগমন সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহার খেরকা মোবারক খাস কামালতে পরিপূর্ণ করতঃ নিজ সাহেবজাদা ও খলিফা হজরত তাজুদ্দিন আবদুর রাজ্জাক র.কে প্রদান করিয়া অসিয়ত করিয়া গিয়াছিলেন যে, মোজাদ্দেদে আলফে সানি শায়েখ আহমদের আবির্ভাব ঘটিলে যেন এই খেরকা তাঁহার নিকট হাওয়ালা করিয়া দেওয়া হয়। উক্ত খেরকা শরীফ আমানতস্বরূপ ক্রমাগতভাবে তাঁহার খলিফাগণের মাধ্যমে সর্বশেষে হজরত শাহ্ সেকেন্দার কায়থলী র. এর নিকট আসিয়া পৌঁছিল। তিনি ছিলেন বংশের শেষ খলিফা এবং মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর সমসাময়িক। তিনি একদিন স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার দাদা কাদেরিয়া তরিকার বিখ্যাত বুজর্গ হজরত শাহ্ কামাল কায়থলী র. তাঁহাকে বলিতেছেন, 'গাউসে আজম র. এর অসিয়ত অনুযায়ী হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র.কে খেরকা শরীফখানি হাওয়ালা করিয়া দাও।'

হজরত শাহ্ সেকেন্দার র. ভাবিলেন, ঘরের নেয়ামত ঘরেই শোভা পায়। তাই তিনি খেরকা শরীফ প্রদানের ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করিলেন না।

কিছুদিন পরে পুনরায় হজরত শাহ্ কামাল কায়থলী র. স্বপ্নে তাঁহাকে খেরকা প্রদানের জন্য তাগিদ দিলেন। কিন্তু তবুও তিনি তাহা দিলেন না।

বিলম্ব দেখিয়া হজরত শাহ্ কামাল কায়থলী র. পুনর্বার স্বপ্নে দর্শন দিয়া রাগতঃ স্বরে বলিলেন, 'যদি তুমি পরকালের নিরাপত্তা কামনা কর এবং তরিকার নেসবত অটুট রাখিতে চাও তবে খেরকা শরীফ আজই হজরত শায়েখ আহমদ র. এর নিকট পেশ কর। নতুবা নেসবত ও কামালত সবই ছলব করিয়া লওয়া হইবে।'

স্বপ্ন দেখিয়া হজরত শাহ্ সেকেন্দার র. ভীত হইয়া পড়িলেন। অতি প্রত্যুষে তিনি খেরকা শরীফ লইয়া হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর বাসগৃহ অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি রা. ফজরের নামাজের পর মোরাকাবায় রত ছিলেন। মোরাকাবা হইতে ফারেগ হইবার পর শাহ্ সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করিলেন এবং খেরকা শরীফখানি তাঁহার হাওয়ালা করিয়া দিলেন।

তিনি নির্জন কক্ষে গমন করিয়া খেরকা শরীফখানি পরম শ্রদ্ধাভরে পরিধান করিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বিস্ময়কর ঘটনার প্রকাশ ঘটিতে লাগিল। খেরকা-শরীফ পরিধানের সঙ্গে সঙ্গে কাদেরিয়া তরিকার নেসবত প্রবল হইল। কাদেরিয়া নূর তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। নকশবন্দিয়া নেসবত বিলুপ্ত হইল। কিছুক্ষণ এই অবস্থা চলিল। পুনরায় নকশবন্দিয়া নেসবত প্রবল হইল এবং কাদেরিয়া নেসবতকে ঢাকিয়া ফেলিল। পর্যায়ক্রমে কয়েকবার এইরূপ ঘটিল।

ইতোমধ্যে হজরত গাউসে আজম র. তশরিফ আনিলেন। তাঁহার সহিত আসিলেন সৈয়েদেনা আমিরুল মোমেনিন হজরত আলী করমুল্লা ওয়াজহাহু এবং কাদেরিয়া তরিকার অন্যান্য বিশিষ্ট বুজর্গগণ। কিছুক্ষণ পর আসিলেন গরীবে নেওয়াজ হজরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি র. ও তাঁহার সিলসিলার অন্যান্য বুজর্গবৃন্দ। অতঃপর হজরত বাহাউদ্দিন নকশ্বন্দ র., সৈয়েদেনা আমিরুল মোমেনিন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহুসহ তাঁহার সিলসিলার সমস্ত বুজর্গগণ হাজির হইলেন। ক্রমে ক্রমে কিবরিয়া আলিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া বুজর্গগণও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এইবার আলোচনা শুরু হইল। প্রথমে উভয় হজরত এর মধ্যে ইশারা বিনিময় হইল। হজরত গাউসে আজম র. বলিলেন, 'হজরত মোজাদ্দেদ র. শৈশবকালে আমার তরিকার বুজর্গ হজরত শাহ্ কামাল কায়থলী র. এর জিহ্বা চুষিয়া তরিকার সমুদয় কামালত হাসিল করিয়াছিলেন। সেই কারণে আমার তরিকার খেদমত করিবার জন্য তাঁহার উপর আমার দাবী প্রথম।'

হজরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ র. বলিলেন, 'আমার সিলসিলার খলিফা হজরত বাকী বিল্লাহ র. এর মাধ্যমে তিনি রসুলেপাক স. এর বিশেষ আমানত পাইয়াছেন। অতএব তিনি আমার সিলসিলার খেদমত করিবেন।'

গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি র. বলিয়া উঠিলেন, 'তাঁহার পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন আমারই সিলসিলাভুক্ত। তিনি আমাদেরই কোলে প্রতিপালিত হইয়াছেন এবং সর্বপ্রথম আমার তরিকার খেলাফত লাভ করেন। তাই সর্বাপেক্ষা আমার দাবী অগ্রগণ্য।'

কিবরিয়া আলিয়া ও সোহরাওয়ার্দিয়া বুজর্গগণও তাঁহাদের নিজ নিজ দাবীর সপক্ষে দলিল পেশ করিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া আলোচনা চলিল। কেহই দাবী

ছাড়িতে চান না। এই গুরুত্বপূর্ণ ও মনোহর মহফিলে অংশগ্রহণ করিবার জন্য এত অধিক সংখ্যায় অলি আল্লাহ্গণের রূহ মোবারক উপস্থিত হইল যে, সেরহিন্দ শরীফের শহর ও শহরতলীর কোথাও কোন জায়গা খালি রহিল না।

অবশেষে এই জটিল বিষয়ের নিষ্পত্তি করিয়া দিবার জন্য হজরত রসুলেপাক স. তশরিফ আনিলেন। অতঃপর বলিলেন, ‘আপনারা আপনাদের নেসবতের কামালতসমূহ সম্পূর্ণরূপে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানিকে সোপর্দ করুন। ইনি আপনাদের সকলেরই খলিফা। আপনারা সকলেই তাঁহার নিকট হইতে সমানভাবে পারিশ্রমিক লাভ করিবেন। কিন্তু যেহেতু নবীদের পরে শ্রেষ্ঠ মানব হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. হইতে নকশবন্দিয়া তরিকার উৎপত্তি এবং ইহাতে আজিমাতের সহিত সুন্নতের অনুসরণ ও বেদাত বর্জন করা হয় তাই তাজদীদের (সংস্কারের) বিশেষ খেদমত সম্পাদনের ক্ষেত্রে এই তরিকাটি সর্বাপেক্ষা যোগ্যতাপূর্ণ।

সব সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। রসুলুল্লাহ্ স. এর নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেকেই নিজ নিজ তরিকার পরিপূর্ণ কামালাত হজরত মোজাদ্দেদ র.কে প্রদান করিলেন। ইহার সহিত যুক্ত হইল আলফে সানির মোজাদ্দেদের খাস কামালাত ও নেসবত এবং রসুলেপাক স. কর্তৃক প্রদত্ত খাস কামালাতসমূহ। ইহা ছাড়াও মিশ্রিত হইল কাইউমিয়াত, ইমামত, খাজিনাতুর রহমত প্রভৃতি বিশেষ কামালাত। জন্ম নিল এক সমষ্টিভূত তরিকা। সর্ব প্রকার কামালাতের আধার নতুন এই সিলসিলার নাম হইল, ‘তরিকায়ে মোজাদ্দেদিয়া।

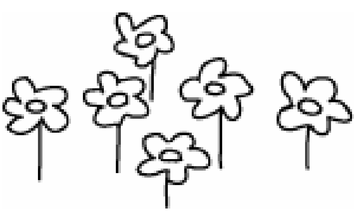

হজরত মোজাদ্দেদ র. তৃতীয়বারের মতো দিল্লী আগমন করিলেন। দেখিলেন, হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. পূর্বের চাইতে অনেক দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। শরীরও অত্যন্ত কৃশ হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত শরীরে শক্তিহীনতার চিহ্ন স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

একদিন হজরত খাজা র. এরশাদ করিলেন, ‘আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বাঁচিবার আশা কম।’

তিনি তাঁহার দুই পুত্র খাজা ওবায়দুল্লাহ্ ও খাজা আবদুল্লাহকে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সম্মুখে পেশ করিলেন। পুত্রদ্বয় তখনও দুগ্ধপোষ্য শিশু। হজরত খাজা র. তাঁহাদিগকে দেখাইয়া বলিলেন, 'ইহাদের উপর তাওয়াজ্জোহ্ দিন।'

হজরত মোজাদ্দেদ র. পীরজাদাদ্বয়ের প্রতি তাওয়াজ্জোহ প্রদান করিলেন। এই তাওয়াজ্জোহ্ হজরত খাজা র. এর উপরও গিয়া পড়িল। ইহার পর তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র.কে তাঁহার পীর আম্মার প্রতি গায়েবানা তাওয়াজ্জোহ্ ফরমাইবার এরশাদ করিলেন। তিনি তাহাই করিলেন।

অতঃপর হজরত খাজা র. এরশাদ করিলেন, 'সুউচ্চ বৈশিষ্টপূর্ণ নক্শবন্দি সিলসিলার মধ্যে বর্তমানে আকাশের নীচে হজরত শায়েখ আহমদের মত মর্যাদাসম্পন্ন আর কেহ নাই। তিনি মোকাম্মেল, মুরাদ, মাহবুব ও কুতুব। সাহাবা, তাবেঈন, কামেলীন, মুজতাহিদ ইমামগণের পরে তাঁহার মতো এইরূপ খাছ ব্যক্তি খুবই কমই দেখা যায়। এই তিন-চার বছর আমি প্রকৃতপক্ষে মুর্শিদি করি নাই, ক্রীড়া কৌতুক করিয়াছি মাত্র। কিন্তু সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য। আমার সামান্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। হজরত শায়েখ আহমদ র. এর মতো এক বৃহৎ হাস্তির আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে।'

তিনি আরও এরশাদ করিলেন 'মিঞা শায়েখ আহমদ ও আমার সম্পর্ক খাজা আবুল হাসান খেরকানী র. ও তাঁহার মুরিদ আবদুল্লাহ্ আনসার র. এর মতো। আবদুল্লাহ্ আনসার র. বলিয়াছিলেন, 'আমার পীর যদি বর্তমানে বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে আমার মুরিদ হওয়া ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। 'মিঞা শায়েখ আহমদ কুতুবে মাদার ও কুতুবে এরশাদ এর কামালাত একত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার তোফায়েলে আমি জানিতে পারিলাম যে, তৌহীদে অজুদি (হামাউস্ত) 'সবই খোদা' একটি সংকীর্ণ সড়ক তুল্য। প্রকৃত রাজপথ অবশ্যই অন্যরূপ। বাস্তবিকই তিনি এমন এক সূর্য যাঁহার ফয়েজ ও নূরে দোজাহান আলোকিত হইতেছে।'

হজরত খাজা র. ও হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সম্পর্কই কিরূপ মধুর ছিল তাহা সত্যিই কল্পনাতীত। একে অন্যের প্রতি কিরূপ আদব প্রদর্শন করিতেন তাহা বর্ণনাযোগ্য নয়। উভয়ে উভয়ের নিকট যে সমস্ত চিঠিপত্র লিখিয়াছেন তাহাতেও আদবের আতিশয্য লক্ষণীয়। এখানে দুইটি পত্রের আংশিক উদ্ধৃতি দেওয়া হইল।

হজরত খাজা র. এর পত্র

'...আল্লাহ্পাক আপনাকে কামালাতের গৌরবময় শিখরে উন্নীত হওয়ার তৌফিক দান করুন। বুজর্গগণের পেয়ালার অংশ জমিনের ভাগ্যেও জোটে। যাহা হকিকতের হাল তাহাই লিপিবদ্ধ হইল। পীর আবদুল্লাহ্ আনসার র.

ফরমাইয়াছিলেন, হজরত আবুল হাসান খেরকানী র. এখন মওজুদ থাকিলে আমার মুরিদ হওয়া ছাড়া তাঁহার উপায় ছিল না। যদিও আমিই ছিলাম তাঁহার মুরিদ। যদি গুণহীনদের স্বভাব এইরূপ হয় তবে যে গুণের প্রভাবে বন্দী সে কেন সমর্পণের অন্বেষায় লিপ্ত হইবে না এবং সৌরভ পাইবার জন্য কেন সে অনুসরণ হইতে বিরত থাকিবে? এক্ষণে বিলম্ব ও চিন্তা ভাবনার কারণ মুখাপেক্ষীহীনতা নয়। বরং আপনার ইশারার ইন্তেজার করিতেছি।

এখন তো সুযোগ আছে এবং অন্তরে বাসনার প্রাবল্যও বিদ্যমান। আল্লাহ্‌পাক যেন ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং অহংকার ও নিজেকে উৎকৃষ্ট জানার ধারণা হইতে আল্লাহ্‌পাক আমাকে রক্ষা করুন। জনাব সৈয়দ সালেহ্ নিশাপুরী অবশিষ্ট সুলুকসমূহ সমাপ্ত করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছেন। যদিও সময় এখন প্রতিকূল, তবুও তিনি কালক্ষেপণ করিতে রাজী নন। সুতরাং আপনার সহবতে প্রেরণ করা হইল। ইনশা-আল্লাহ্ তিনি তাঁহার যোগ্যতা অনুযায়ী ফায়দা হাসিল করিতে পারিবেন এবং আপনার পূর্ণ তাওয়াজ্জোহ্ ও কৃপা লাভ করিবেন। ওয়াস্ সালাম।...’

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর পত্র

নগণ্য খাদেমের নিবেদন এই যে, অনেকদিন হইতে হুজুরের দরবারের কোন প্রকার সংবাদ অবগত নই। পথ পানে দৃষ্টি মেলিয়া আছি।

বারতা শ্রবণ করি বিরহ বঁধুর,
স্নেহের জীবন যদি হয়গো মধুর
প্রকৃত অবস্থা এর নাহি যায় বলা।
সহে কি অন্তরে কভু বিরহের জ্বালা।

জানি যে, সে দরবারে উপস্থিতির সৌভাগ্য লাভের অযোগ্য।

যদিও না যেতে পারি নিকটে তাঁহার
দূর হতে শুনিব তো সুরের বাহার।

বিস্ময়ের ব্যাপার, অতি দূরত্বকে নৈকট্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং চরম বিরহকে মিলন আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে যেন ইহার দ্বারা নৈকট্য ও মিলন তিরোহিত করিবার ইশারা করিয়াছেন।

কি করে পাই আমি ছোয়াদের দেখা-
গিরি গহবর পথে পথচারী একা।

অবিচ্ছিন্ন চিন্তারাশি আমার হস্তগত হইল। আকাংখিত ব্যক্তিকেও আকাংখাকারীর ইচ্ছার প্রার্থী হওয়া প্রয়োজন এবং মাশুককেও আশেকের প্রেমে পতিত হইয়া আশেক হওয়া উচিত। হজরত নবী করিম স. মাশুক হইয়াও আশেক এবং আল্লাহ্‌পাকের প্রেমাসক্ত ছিলেন। এই কারণে হাদিস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'হজরত নবী করিম স. চির বেদনাহত ও সদাচিন্তিত অবস্থায় কালক্ষেপণ করিতেন' এবং তিনি আরও বলিয়াছেন যে, 'আমার মত কোন পয়গম্বরই দগ্ধীভূত হন নাই।' প্রেমিকগণ প্রেমের যন্ত্রণা সহিতে পারেন। কিন্তু প্রেমাষ্পদের জন্য উহা অসহ্য। এইরূপ কথার অন্ত নাই।

প্রেমের কাহিনী কভু অন্ত নাহি জানে
তোমার গুণগান প্রভু ত্যাজিব কেমনে?

পত্রবাহক শায়েখ আল্লাহ্‌ বখশ এক প্রকারের মহব্বত ও জজবা হাসিল করিয়াছেন। তাঁহারই আগ্রহে কিছু লিপিবদ্ধ করিলাম।

মোটকথা, তিনি আপনারই খেদমতের উদ্দেশ্যে গমন করিতেছেন। তিনি তাঁহার আরও অনেক উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছিলেন কিন্তু সেই সব বিষয়ে আমার অনুমোদন না থাকায় শুধু সাক্ষাতের জন্য গমন করিতে স্বীকৃত হইয়া পত্র লিপিবদ্ধ করাইয়া লইলেন।

অধিক উল্লেখ করা বেয়াদবি।

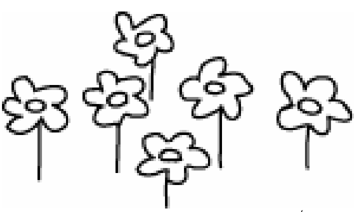

হজরত মোজাদ্দেদ র. এইবার সেরহিন্দ শরীফে প্রত্যাবর্তনের এজাজত পাইলেন। সেরহিন্দ শরীফে কিছুদিন অবস্থানের পর হজরত খাজা র. এর তরফ হইতে লাহোর যাইবার এরশাদ হইল। তিনি লাহোর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

হজরত মোজাদ্দেদ র. সকলের নিকট এখন অতি পরিচিত নাম। দিন দিন সূর্যের আলোর মতো তাঁহার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তিনি লাহোর গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপস্থিতির সংবাদ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সাধারণ মানুষ ছাড়াও খ্যাতিমান আলেমগণও তাঁহার পবিত্র হাস্তির সহবত লাভের জন্য তাঁহার নিকট ভিড় করিতে লাগিলেন।

মাওলানা জামালউদ্দিন তিলবি র. ছিলেন বিখ্যাত আলেম। তিনি 'ওয়াহ্দাতুল অজুদ' অস্বীকার করিতেন। তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর আগমন সংবাদ পাইয়া ওয়াহ্দাতুল অজুদ সম্বন্ধে বাহাছ করিবার জন্য তাঁহার নিকট গমন করিলেন। হজরত তাঁহার সহিত বাহাছ করিলেন না। বরং তাঁহাকে লইয়া খাস কামরায় গমন করিলেন। তিনি মুহূর্তমধ্যে মাওলানা সাহেবকে পরিষ্কাররূপে তৌহিদের মাকাম দেখাইয়া দিলেন। সব দেখিয়া মাওলানা সাহেব ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন এবং হজরতের হাতে বায়াত গ্রহণ করিলেন।

ক্রমে ক্রমে মাওলানা আবদুল হাকিম শিয়ালকোটি প্রভৃতি বহু বিখ্যাত আলেম তাঁহার মুরিদগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ধন্য হইলেন। অনেক মাশায়েখও তাঁহার নিকট হইতে ফয়েজ হাসিল করিবার জন্য আগমন করিতে লাগিলেন। নেসবতে সিদ্দিকীর নূরে চতুর্দিক গুলজার ইহয়া গেল।

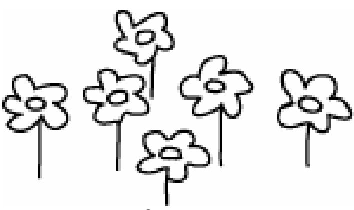

হজরত বাকী বিল্লাহ্ র. এর বয়স চল্লিশ বৎসরে পড়িয়াছে। শারীরিক দুর্বলতা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। ইদানিং তিনি যেন কেমন ইয়া গিয়াছেন। কাহারও মৃত্যু সংবাদ শুনিলেই তাঁহার দুই চোখ অশ্রুসজল হইয়া যায়। অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করেন, 'আহ্! বড়ই সংক্ষিপ্ত।'

কেহই ইহার অর্থ বুঝিতে পারে না।

একদিন তিনি তাঁহার বিবি সাহেবাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমার বয়স যখন চল্লিশ বছর পূর্ণ হইবে, তখন একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিবে।

আর একদিন বলিলেন, 'আমি খাবে দেখিলাম, কে যেন আমাকে বলিতেছেন যে উদ্দেশ্যে আপনাকে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহা সমাপ্ত হইয়াছে।'

কিছুদিন পর আবার বলিলেন, 'অল্পদিনের মধ্যে নকশবন্দিয়া তরিকার একজন ইন্তেকাল করিবেন।'

পুনরায় আর একদিন বলিলেন, 'শুনিলাম কে যেন বলিতেছেন– বর্তমান জামানার কুতুবের ইন্তেকাল হইল। শুনিয়া আমি আমার শোকগাঁথা কাসিদা (কবিতা) আবৃত্তি করিতে লাগিলাম।'

জমাদিউস্ সানি মাস দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল। মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন। রোগশয্যায় একদিন বলিলেন, ‘হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহরার র. কে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি আমাকে পিরহান পরিধান করিতে বলিতেছেন।’ অতঃপর রোগকাতর মুখে হাসি ফুটাইয়া বলিলেন, ‘যদি সুস্থ হই তবে পিরহান পরিব। নতুবা কাফনের পিরহানই পরিতে হইবে।’

হজরতের অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যাইতে লাগিল। একদিন তিনি আল্লাহ্পাকের মহব্বতে এমনভাবে বিলীন হইয়া গেলেন যে, শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত সবাই মনে করিলেন– হয়তো সবই শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ক্ষণকাল পরে তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন, ‘ইহাই যদি মৃত্যু হয় তবে মৃত্যু অতি বৃহৎ নেয়ামত। হৃদয় এই পরিবেশের আকর্ষণ ত্যাগ করিতে রাজি হয় না।’

পঁচিশে জমাদিউস্ সানি, শনিবার। হিজরী ১০৯২ সাল। মহান নকশবন্দি বুজর্গ হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. এর বিরহ যন্ত্রণার অবসান হইল। পরম শান্তির সহিত তিনি প্রিয়তম মাশুক আল্লাহ্পাকের মিলন লাভ করিলেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।

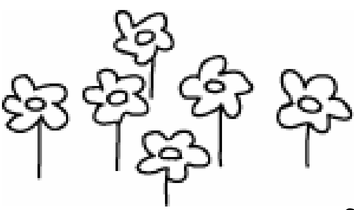

হজরত মোজাদ্দেদ র. লাহোরে জিকিরের হালকায় সঙ্গীগণের সহিত উপবিষ্ট। এমন সময় সংবাদ পৌঁছিল– হজরত খাজা র. আর পৃথিবীতে নাই। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করিলেন, ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।’ তারপর তৎক্ষণাৎ তিনি দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। দিবারাত্রি পথ চলিতে লাগিলেন। বিশ্রাম নাই। বিশ্রাম করিবার সময় নাই। পথে সেরহিন্দ শরীফ পড়িল। কিন্তু তিনি যাত্রা বিরতি করিলেন না। পরিবারবর্গের সহিত মোলাকাতও করিলেন না।

দিল্লী শহরের বাহিরে আজমিরী দরজার কাছে গিয়া তিনি থামিলেন। এইখানে কদম রসূলের নিকট হজরত খাজা র. এর রওজা মোবারক। জীবিত অবস্থায় তিনি একবার সঙ্গীগণসহ এইখানে আসিয়াছিলেন। জায়গাটি তাঁহার বড়ই পছন্দ হইয়াছিল। অজু করিয়া তিনি এইস্থানে দুই রাকাত নামাজ আদায় করিয়াছিলেন। তখন এই স্থানের কিছু মাটি তাঁহার কাপড় মোবারকে লাগিয়া গিয়াছিল। হজরত বলিয়াছিলেন, ‘এইখানকার মাটি আমাকে ছাড়িতে চায় না।’ সবই আল্লাহ্পাকের

মর্জি। এই স্থানের মাটি সত্যই তাঁহাকে ছাড়িল না। সোহাগভরে হজরত খাজা র.কে বুকে করিয়া রাখিল।

হজরত মোজাদ্দেদ র. মোর্শেদের মাজার জিয়ারত করিলেন। পীরজাদা ও পীরভাইগণকে সান্ত্বনা দিলেন। মোর্শেদের অসিয়ত ও এরশাদ অনুযায়ী তিনি এইবার পূর্ণভাবে তাঁহার মুরিদদের ও খলিফাগণের তরবিয়তের ভার নিজের স্কন্ধে উঠাইয়া লইলেন।

আবার জিকিরের হালকা গুলজার হইল। হজরত খাজা র. এর খলিফা ও মুরিদগণ হজরত মোজাদ্দেদ স. এর প্রতি যথেষ্ট আদব ও তাজীম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মুরিদের মত হজরতের নিকট হইতে ফয়েজ হাসিল করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পর এক বিপত্তি দেখা দিল। কয়েকজন অপরিণামদর্শী মুরিদ হিংসাবশতঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সমালোচনা করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার আত্মসম্মানবোধে আঘাত লাগিল। তিনি তাঁহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন। প্রথমতঃ তিনি তাঁহাদিগকে ওয়াজ নসিহত করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সফল হইলেন না। অতঃপর তিনি তাঁহাদের কয়েকজনের নেসবত ও কামালিয়াত ছলব করিয়া লইলেন। ইহাতেও তাহাদের চৈতন্যোদয় হইল না। ইহার কিছুদিন পর তিনি সেরহিন্দ শরীফে চলিয়া গেলেন।

বিরোধী দলের নেতৃত্ব ছিল হজরত খাজা র. এর খলিফা তাজউদ্দিন সম্ভলী এর হাতে। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার নেসবত ছলব করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহাতে অনুতাপের পরিবর্তে তাঁহার আরো ক্রোধের উদ্রেক হইল। ইহাতে হজরত শায়েখ আহমদ র. এর বিরুদ্ধে খতম পড়া শুরু করিয়া দিলেন। খতম পাঠকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন কাশফধারী। তিনি কাশফ দ্বারা যাহা দেখিলেন তাহাতে অত্যন্ত পেরেশান ও ভীত হইয়া পড়িলেন। ঘটনাটি তিনি অন্য সাথীদের নিকট বর্ণনা করিলেন। বলিলেন, 'আমরা প্রত্যেকেই আলো জ্বালাইলাম। হঠাৎ প্রবল ঝড় উঠিল। সমস্ত আলো নিভিয়া গেল। অদৃশ্য স্থান হইতে আওয়াজ আসিল হজরত শায়েখ আহমদ র. এর বিরুদ্ধে প্রজ্জ্বলিত আলোগুলি রসুলুল্লাহ্ স. এর কোপ নজরে পতিত হইয়া নিভিয়া গিয়াছে।'

ঘটনা শুনিয়া বিরোধীদলের সবাই ভীতসন্ত্রস্ত ও অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শায়েখ তাজ সাহেব স্বয়ং একদিন স্বপ্নে দেখিলেন, 'একটি জাঁকজমকপূর্ণ সুসজ্জিত মহফিল। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আউলীয়াগণ মহফিলে শরীক হইয়াছেন। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি শায়েখ আহমদ র. মহফিলের প্রধান ব্যক্তিত্ব। তাঁহাদের মধ্য হইতে বুজর্গ শায়েখ তাজউদ্দিনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,

‘হজরত শায়েখ আহমদ র. এর বিরোধিতার কারণেই তোমার নেসবত ছলব করিয়া লওয়া হইয়াছে।’

খাজা হুছামুদ্দিন আহমদও একদিন মোরাকাবায় দেখিলেন, রসুলুল্লাহ্ স. খোতবায় হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রশংসা করিতেছেন। অবস্থা দেখিয়া বিরোধীগণ সবাই তওবা করিলেন এবং তাঁহার দিকে রুজু হইলেন। শায়েখ তাজ নিজের তরফ হইতে ও অন্যান্য পীর ভাইগণের তরফ হইতে মাফ চাহিয়া হজরতের নিকট একটি দরখাস্ত পেশ করিলেন।

হজরত খাজা র. এর ওরসের সময় আসিল। হজরত মোজাদ্দেদ র. দিল্লী আসিলেন। শায়েখ তাজ ও সকল বিরোধী ভাইগণ অনাবৃত মস্তকে গলায় পাগড়ী বাঁধিয়া শহর হইতে কয়েক মাইল দূর গিয়া নিজেদের কৃতকর্মের জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাহিয়া হজরতকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া লইয়া আসিলেন। হজরতের বুকে রহমতের জোয়ার উথলিয়া উঠিল। অনুতপ্ত পীর ভাইগণকে তিনি মাফ করিয়া দিলেন।

সত্যের সহিত মিথ্যার সংঘর্ষ আবহমান কাল হইতে। আল্লাহ্পাকের দুনিয়ায় আল্লাহ্পাকেরই হুকুমত কায়েম হইবে। ইহাইতো স্বাভাবিক। মানুষ আল্লাহ্পাকের খলিফা হিসাবে আল্লাহ্পাকের আইন দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিবে। তারপর সমস্ত শক্তির মালিক, হেকমতের মালিক আল্লাহ্পাকের দরবারে সফলতার জন্য প্রাণ ভরিয়া শোকরিয়া জানাইবে। যুগে যুগে এই গুরু দায়িত্বের ভার নবী আ.গণের উপর অর্পিত হইয়াছে। তাঁহারা আল্লাহ্পাকের শক্তি ও সাহায্যে বলীয়ান হইয়া তাঁহাদের নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে অবিরাম পরিশ্রম করিয়া শয়তানের কুমন্ত্রণায় পতিত মানুষকে মুক্ত করিয়াছেন। মানব জীবনে কল্যাণের প্লাবন আনিয়াছেন। প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন আল্লাহ্পাকের একক হুকুমত।

হজরত আদম আ. হইতে শুরু করিয়া এমনিভাবে নবুয়তের নূরের ধারা চলিয়া আসিতেছে। আল্লাহ্পাকের কি অসীম দয়া। তাঁহার করুণার প্রকৃত বর্ণনা কোন ভাষা প্রকাশ করিতে পারে না। কোন কল্পনা ধারণ করিতে পারে না। তিনি তাঁহার

মহব্বতের গভীর কেন্দ্র হইতে, রহমতের অবর্ণনীয় রহস্যময় অবস্থা হইতে মানব জাতিকে সৃষ্টি করিয়া স্থূলতম স্থান এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু সৃষ্টির প্রতি তাঁহার কি অসীম প্রেম, কি অনির্বচণীয় ভালবাসা যে, তিনি সৃষ্টিকে ছাড়িয়া দূরে যাইতে পারেন নাই। বলিয়াছেন, 'নাহনু আকরাবো ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারীদ'– আমি তোমাদের প্রাণরগ অপেক্ষাও নিকটে। সত্যিই তাই, আমরা আমাদের যতখানি নিকটে তাহার চেয়েও তিনি আমাদের অধিক নিকটে। তাই তো অন্ধকার হইতে আলোককে, মিথ্যা হইতে সত্যকে পৃথক করিবার দায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করিয়াছেন। অবুঝ, অক্ষম, অজ্ঞ তাঁহার বান্দাগণের ভালমন্দ বুঝাইবার জন্য সত্যের বাণীবাহক প্রেরণ করিয়াছেন। নবুয়তের নূর প্রবাহিত করিয়াছেন।

আখেরী জামানার পয়গম্বর জনাবে আহমদ মুজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর আবির্ভাবের মাধ্যমে নবুয়তের সেই নূরের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। মানবের স্বভাবধর্ম ইসলাম পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সূর্য উদিত হইলে যেমন নক্ষত্ররাজি আলোক বিচ্ছুরণে অক্ষম হইয়া পড়ে, তেমনি সাইয়েদুল মুরসালিন হাবীবে পাক স. এর আবির্ভাবে নবুয়তের দ্বার রুদ্ধ হইল।

হজরত হাবীবে পাক স. এর ইন্তেকালের পর হাজার বৎসর গত হইয়াছে। হাদিস শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে কখনো একই সঙ্গে একাধিক মোজাদ্দেদ আগমন করিয়াছেন। বিশেষ ক্ষেত্রে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া তাঁহারা দীন ইসলাম হইতে বেদাত কুসংস্কার দূরীভূত করিয়াছেন। দীনের সংস্কার করাই যে তাঁহাদের মূল দায়িত্ব।

হজরত শায়েখ আহমদ ফারূকী সেরহিন্দি র. ও মোজাদ্দেদ। ইহা রসুলেপাক স. এর খোশখবরী। কিন্তু তিনি শতাব্দীর মোজাদ্দেদ নহেন। হাজার বছরের মোজাদ্দেদ। হাজার বছর ধরিয়া দ্বীন ইসলামে বেদাত কুসংস্কারের পঙ্কিলতা প্রবেশ করিয়াছে। সমস্যার অন্ত নাই। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে ইসলাম বিরোধী শক্তির শক্ত শিকড়। মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে নাস্তিকতা কুফরী বেদাতের এক বৃহৎ বিষবৃক্ষ। এই বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে এবং ইহার জন্য তাঁহাকে এককভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ হাজার বছরের মোজাদ্দেদ কখনও একাধিক হন না। পূর্বে হাজার বছর গত হইলে সাধারণ পয়গম্বরের দ্বারা কার্য সম্পাদিত হইত না। প্রয়োজন হইত উলুল আজম পয়গম্বরের। নতুন শরীয়ত লইয়া তাঁহারা মানুষের হেদায়েতের জন্য আগমন করিতেন।

হজরত সেরহিন্দি র. হাজার বছরের মোজাদ্দেদ। তাই তিনি উলুল আজম পয়গম্বরের কামালত বিশিষ্ট মোজাদ্দেদ। শুধু পীরমুরিদি যে তাঁহার শোভা পায়

না। তাঁহাকে পালন করিতে হইবে সংস্কারের গুরু দায়িত্ব। কি করিয়া সেই সংস্কারের কার্য আরম্ভ করা যায় তাহাই তিনি চিন্তা করিতে শুরু করিলেন।

স্বয়ং আল্লাহ্পাক যাঁহার সহায় তাঁহার সর্ব প্রকার কার্যই সহজ হইয়া যায়। তিনি প্রতিটি সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যাগুলির উপর তাঁহার মোজাদ্দেদ সুলভ দৃষ্টি বুলাইয়া লইলেন। প্রতিটি সমস্যা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বুঝিলেন যে, দেশব্যাপী এই বিরাট ফেতনার মূল উৎস বেদীন বাদশাহ্। দুনিয়াদার আলেম ও ভণ্ড সুফীগণ এই ফেতনাকে আরো বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহা ছাড়া হিন্দু, জৈন, খৃষ্টান, পারসী প্রভৃতি ধর্ম নেতাগণ বাদশাহ্র অন্তর্গত দুর্বলতার সুযোগ লইয়া নিজেদের শয়তানী উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিয়া দ্বীন ইসলামকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিতেছে।

প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশাহ্ আকবর দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার প্রবর্তিত 'দ্বীন-ই-ইলাহী' ধর্ম ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত। বাদশাহ্র সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য। মিথ্যার সহিত সত্যের সংঘাত না হইয়া পারে না। সত্য আসিয়াছে। মিথ্যা তিরোহিত হইবে। নিশ্চয়ই মিথ্যা তিরোহিত হইবে।

বাদশাহ্ জালালুদ্দিন আকবর মাত্র তের বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পিতা হুমায়ুন মৃত্যুর পূর্বে বৈরাম খাঁকে তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া যান। কিন্তু বৈরাম খাঁকে বেশীদিন অভিভাবকত্ব করিতে হয় নাই। অল্পদিন পরেই আকবর রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করেন।

তাঁহার জীবনের প্রথম দিককার ঘটনাবলী হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি প্রথম জীবনে বড়ই ধর্মভীরু ছিলেন। ঘরে-বাহিরে সর্বত্র তিনি জামাতের সহিত নামাজ আদায় করিতেন। তিনি পাঁচজন আলেমকে নামাজে ইমামতি করিবার কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সফরের সময় নামাজের জন্য একটি খাস তাঁবুর ব্যবস্থা করা হইত। তিনি উহাতে জামাতের সহিত নামাজ আদায় করিতেন। আলেম সমাজের প্রতি ভক্তি ছিল অগাধ। তাঁহার রাজত্বের প্রথম দিকে ছদরে জাহান ছিলেন– আবদুন নবী। বাদশাহ্ কখনো কখনো নিজেই তাঁহার বাসভবনে হাদিস শুনিবার জন্য যাইতেন। তিনি তাঁহার সামনে থাকা অবস্থায় জুতাও পরিধান করিতেন না।

কোন কোন সময় তিনি পায়ে হাঁটিয়া গরীবে নেওয়াজ হজরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশতি র. এর রওজা মোবারক জেয়ারত করিতে যাইতেন। তৎকালীন বিখ্যাত বুজর্গ শেখ সেলিম চিশতি র. এর প্রতিবেশী হিসাবে বসবাস করিবার জন্য তিনি ফতেহপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ফতেহপুরে তিনি 'অনুপ তালাও' নামে একটি সরোবর খনন করান এবং উহার চারিধারে কয়েকটি ইমারত নির্মাণ করিয়া সেইগুলির নাম 'ইবাদতখানা' রাখেন।

জুমআর দিনে এইসব ইবাদতখানায় আলেমগণের মধ্যে ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হইত। আলেমগণের খেদমতের ভার বাদশাহ্ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে অর্থের লোভে বহু আলেম এই মহফিলে যোগদান করিতেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই বাদশাহ্র প্রিয়পাত্র হইবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিতেন। তাই একজন আরেকজনকে হিংসা করিতেন। ফলে তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ লাগিয়াই থাকিত। নির্বিবাদে একজন আরেকজনকে 'কাফের' ফতোয়া দিয়া তাঁহারা নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি প্রদর্শনের প্রয়াস পাইতেন। একজন কোন কিছু 'হালাল' ফতোয়া দিলে অন্যজনের প্রধান কাজই হইত যেভাবেই হোক উহাকে 'হারাম' প্রতিপন্ন করা।

মোল্লা আবদুল্লাহ্ সোলতানপুরী 'মখদুমুল মুলক' খেতাবে ভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার উপর হজ ফরজ নয় বলিয়া ফতোয়া দিয়াছিলেন। বাহানা করিয়া তিনি যাকাত প্রদানও স্থগিত করেন। মৃত্যুর পর তাঁহার লাহোরের বাসভবনে বহুপরিমাণ লুক্কায়িত ধনরত্ন পাওয়া যায়। গোরস্তান হইতেও স্বর্ণভর্তি কয়েকটি সিন্দুক উদ্ধার করা হয়। এইগুলি তিনি মৃত ব্যক্তিদের বাহানায় দাফন করাইয়াছিলেন।

হজরত আবুদল কুদ্দুস গাংগুহী র. এর পৌত্র মাওলানা আবদুন্ নবী ছিলেন শাহী দরবারের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। বাদশাহ্ তাঁহাকে খুবই সম্মান করিতেন। উল্লিখিত 'মখদুমুল মুলক' ও আবদুন নবীর মধ্যে চরম মতানৈক্য ছিল। উভয়ে উভয়ের প্রতি ফতোয়া দিতেন যে, তাঁহাদের পিছনে নামাজ পড়া দুরস্ত নয়।

বাদশাহ্ আলেমদেরকে এতো বেশী ভক্তি করিতেন যে, তাঁহাদেরকে তিনি ইমাম রাজী র. ও ইমাম গাজ্জালী র. হইতেও বড় ধারণা করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের এই সমস্ত জঘন্য নীচ কার্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া ধর্ম বিষয়ে তিনি সন্দিহান হইয়া পড়েন। তাঁহার বিশ্বাসের মূলে ভাঙ্গন ধরে। ক্রমে ক্রমে তিনি পূর্ববর্তী ইমামগণকেও ইহাদের মতো ভাবিতে শুরু করেন এবং ধর্ম বিষয়ে আস্থা হারাইয়া ফেলেন।

সবচেয়ে ভয়াবহ ছিলেন মোল্লা মোবারক নাগুরী ও তাহার দুই পুত্র আবুল ফজল ও ফৈজি। মোল্লা মোবারক নাগুরী সব মযহাব সম্পর্কে এলেম হাসিল

করিবার পর নিজেকে এজতেহাদের দরজাপ্রাপ্ত ভাবিতে শুরু করেন। তিনি কোন মযহাবের অনুগত না থাকিয়া ব্যক্তিগত মাসলা অনুযায়ী ইবাদত করিতে থাকেন। তিনি এলেমের প্রচার ও প্রসারের কাজ ছাড়িয়া দিয়া পুত্রদের সঙ্গে রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়েন।

এইভাবে দুনিয়াদার আলেমগণের দ্বারা মোঘল হুকুমতে সর্বপ্রথম ইসলামবিরোধী বিশ্বাসের বীজ বপন করা হয়। আবুল ফজল, ফৈজী ও তাহার পিতা এক মযহাবনামা জারী করেন। ইহাতে নফ্সপরস্তি ও শয়তানী আকিদার স্পষ্ট নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। এই মযহাবনামায় আরো অনেক দুনিয়াদার আলেম স্বেচ্ছায় দস্তখত করেন। অনেকের নিকট হইতে জোর করিয়া দস্তখত আদায় করা হয়। মযহাবনামাটি ছিল নিম্নরূপঃ

'বাদশাহ্ আকবরের আদল ও ইনসাফের বদৌলতে বর্তমান হিন্দুস্তান পরিণত হইয়াছে শান্তি ও শৃঙ্খলার কেন্দ্রে। এইজন্য এই স্থানে মুক্ত পথের প্রদর্শক আলেম ও সর্বসাধারণের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহারা আরব ও বিভিন্ন দেশ হইতে আগমন করিলেও এই দেশকেই মাতৃভূমি বলিয়া জানেন। এই সমস্ত আলেমগণ সর্বপ্রকার এলেমে বিশেষ পারদর্শী। তাঁহারা সাচ্চা ইমানদার। আকলী ও নকলী বিষয়গুলিতেও তাঁহারা বিশেষজ্ঞ। কোরআন পাকে আল্লাহ্পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ 'আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ মান, রসুলের নির্দেশ মান এবং ঐ সকল লোকের নির্দেশ মান যাহারা তোমাদের প্রতি হুকুমের মালিক।' কতিপয় হাদিস– যথাঃ 'আল্লাহ্র নিকট কেয়ামতের দিন সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হইবেন ন্যায় বিচারক আমির,' 'যে ব্যক্তি আমিরের অনুগত সে যেন আমারই অনুগত এবং যে ব্যক্তি তাঁহার অবাধ্য সে আমারও অবাধ্য।' এই সব হাদিসের মর্মানুসারে এবং আকলী ও নকলী দলিল মোতাবেক আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, আল্লাহ্র নিকট মুজতাহিদগণ অপেক্ষা ন্যায়-পরায়ণ বাদশাহ্ অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। বাদশাহ্ জালালুদ্দিন মোহাম্মদ আকবর বড়ই ন্যায়বান, জ্ঞানী ও বিদ্বান। তাই মুজতাহিদগণের এখতেলাফি বিষয়গুলিতে যদি তিনি তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, জ্ঞান ও নির্ভুল রায় অনুযায়ী আদম সন্তানের জীবিকা ও পার্থিব সুবিধার জন্য কোন একটি দিককে প্রাধান্য দেন এবং উহা করণীয় বলিয়া নির্দেশ প্রদান করেন তবে বাদশাহ্র এই সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য এবং সর্বসাধারণ উহা মানিয়া চলিতে বাধ্য। এইরূপ কোরআন শরীফের প্রতিকূল নয় অথচ যাহা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, বাদশাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত এই ধরনের ফরমান অনুযায়ী প্রতিটি নর-নারী আমল করিতে বাধ্য থাকিবে। ইহার বিরোধিতায়– দ্বীন দুনিয়ার ধ্বংস ও আখেরাতের শাস্তি নিহিত।'

এইরূপ প্রচারের ফলে বাদশাহ্ আকবর নিজেকে মুজতাহিদ মনে করিতে থাকেন। তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে– তিনি নিজেই নতুন কোন ধর্ম প্রবর্তন করিবার যথেষ্ট যোগ্যতা রাখেন। এইভাবে দুনিয়াদার আলেমগণের ফেতনা তাঁহার মনে অবিশ্বাসের বীজ বপন করে। ফলে তিনি ইসলামকে তাঁহার বিবেক দ্বারা বিচার করিতে থাকেন এবং দেখেন যে, ইসলামের প্রতিটি আকিদাই বিবেকের রায়ে টিকে না।

কিন্তু অজ্ঞ বাদশাহ্ বুঝিতে পরিলেন না– বিবেক নিজেই অশুদ্ধ। বিবেক বা মানুষের সাধারণ জ্ঞান কোনদিনই সত্য আবিষ্কারের যোগ্যতা রাখে না। তাহা হইলে মানুষ নিজেই চিন্তাভাবনা গবেষণা করিয়া সত্য আবিষ্কার করিতে পারিত। বড় বড় দার্শনিক ও হিন্দু মুনি-ঋষি ও গ্রীক সাধকগণ সত্য আবিষ্কার করিতে পারিত। তাঁহাদের জ্ঞানচর্চা ও ইসলামবিবর্জিত কঠোর সাধনা করিয়া তাঁহারা মুক্তি পাইতে পারিতেন। কিন্তু তাহাদের সাধনা ও জ্ঞান দ্বারা তাহারা কেবল ভ্রষ্টতাই লাভ করিয়াছেন– অন্য কিছু নয়। বিবেকের কাজ শুধু এইটুকুই– সে বুঝতে শিখিবে যে, আনুগত্যের মাধ্যমেই সে মুক্তি পাইবে। নবী আ.গণ যে জ্ঞান লইয়া এই ধরাধামে আগমন করিয়াছেন সেই অহিলব্ধ নিঃসন্দেহ জ্ঞানের নিকট আত্মসমর্পন করিবে। কারণ মানুষ তাহার আকল ও বিবেক দ্বারা সত্য আবিষ্কার করিবার ক্ষমতা রাখে না বলিয়াই আল্লাহপাক নবী আ. গণকে প্রেরণ করিয়াছেন– যাহাতে মানুষ তাঁহাদের অনুগত হইয়া আল্লাহ্পাকের পরিচয় লাভ করে এবং মুক্তি পায়। কোরআন মজিদে তাই আল্লাহ্পাক ঘোষণা করিয়াছেন 'যাহা কিছু রসূল কর্তৃক প্রাপ্ত হও– তাহা গ্রহণ কর এবং যাহা তিনি করিতে নিষেধ করেন তাহা হইতে বিরত থাক।'

বাদশাহ্ আকবর বিপদসংকুল পথে পা বাড়াইলেন। আবুল ফজলের দল তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ইসলাম ধর্ম পুরাপুরি বিবেকবর্জিত এক মতবাদ। কিছু গরীব বেদুঈন এই ধর্ম প্রবর্তন করেন। তাঁহারা সকলেই ছিলেন ডাকাত ও ফেতনা সৃষ্টিকারী (নাউজুবিল্লাহ্)। বাদশাহ্র দরবারে নবুয়ত, দীদারে এলাহী, শরীয়তের আনুগত্য, হাশর নশর প্রভৃতি বিষয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা শুরু হইল। অহি, মোজেজা, ফেরেশতা– প্রভৃতির অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করাই বাদশাহ্ ও তাঁহার দরবারীদের প্রধান কার্য হইয়া দাঁড়াইল।

বাদশাহ্ আকবর ভাবিতে শুরু করিলেন, ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের পর এক হাজার বৎসর গত হইয়াছে। ইসলামের আয়ু ছিল এক হাজার বৎসর। বর্তমানে তাই নতুন কোন ধর্ম প্রবর্তনের প্রয়োজন। কিন্তু এই নতুন ধর্মের রূপরেখা কিরূপ হইবে তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তিনি দেখিলেন তাঁহার রাজত্বের শতকরা প্রায় পঁচানব্বই জন প্রজাই হিন্দু। শিয়ারাও তাঁহার পিতার আমল হইতে মোঘল সাম্রাজ্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে জৈন সম্প্রদায় অন্যতম। ইহা ছাড়া পারসী বা অগ্নি উপসাকদের কথাও ভাবনা করা উচিৎ। খৃষ্টানরাও সেই সময় আনাগোনা শুরু করিয়াছিল।

বাদশাহ্ সিদ্ধান্তে আসিলেন,– সব জাতির বাদশাহ্ হিসাবে তাঁহার সব ধর্মেরই পৃষ্ঠপোষকতা করা উচিৎ এবং সকল ধর্মের ভাল মতবাদ সমূহ লইয়া নতুন ধর্ম গঠন করিতে হইবে। ইহাতে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহার প্রতি খুশী হইবে। তাহা ছাড়া এই বিশাল সাম্রাজ্য সুষ্ঠুভাবে শাসন করিবার জন্য এই নতুন ধর্মই হইবে সর্বাপেক্ষা বড় অস্ত্র।

বাদশাহ্ আল্লাহ্পাকের উপর তাওয়াক্কোল ছাড়িয়া দিলেন। নিজের বুদ্ধিবিবেচনা অনুযায়ী রাজত্ব রক্ষার অস্ত্র হিসাবে শুরু হইল নতুন ধর্ম রচনার প্রস্তুতিপর্ব।

নতুন ধর্মে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব ছিল হিন্দুদের। ইহা ছাড়াও দেশের প্রত্যেক ধর্মের বুদ্ধিমান ধর্মনেতাগণ শাহী দরবারে আসিয়া বাদশাহ্র সহিত তাহাদের ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করিতেন। বাদশাহ্ তাহাদের অত্যন্ত সমাদর করিতেন এবং আলোচনার বিষয় লইয়া সব সময় গবেষণায় লিপ্ত থাকিতেন।

বহু গবেষণার পর তিনি নতুন এক ধর্ম প্রবর্তন করিলেন। নাম দিলেন 'দ্বীন-ই-ইলাহী'। আশ্চর্যের বিষয়, দ্বীন-ই-ইলাহী ছিল স্পষ্টতই কুফরী। অথচ তাহার নাম রাখা হইয়াছিল দ্বীন-ই-ইলাহী অর্থাৎ আল্লাহ্র ধর্ম।

এই নতুন ধর্মের প্রধান উপাদান ছিল সূর্যের উপাসনা করা। বাদশাহ্ প্রভাতে, দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যায় ও অর্ধরাত্রে বাধ্যতামূলকভাবে সূর্য পূজা করিতেন। তিনি তিলক লাগাইতেন এবং পৈতা পরিতেন। সূর্যোদয়ের সময় ও মধ্যরাত্রিতে নহবত ও নাকাড়া বাজান হইত। এই নতুন ধর্মে সূর্যের নাম উচ্চারণকালে 'জাল্লাত কুদরাতুহু' বলিতে হইত। বাদশাহ্ বিশ্বাস করিতেন যে, সূর্য বাদশাহ্গণের অভিভাবক ও হিতাকাঙ্খী। তিনি তাই হিন্দুদের নিকট হইতে সূর্যকে বশীভূত করিবার মন্ত্র শিখিয়া লইয়াছিলেন। মধ্যরাত্রে ও ভোরে তিনি এই মন্ত্র পাঠ করিতেন। শিবরাত্রিতে তিনি সমস্ত রাত্রি যোগীদের আসরে বসিয়া থাকিতেন এবং বিশ্বাস করিতেন যে, ইহাতে আয়ু বৃদ্ধি পায়।

ব্রাহ্মদাণ নামীয় এক ব্রাহ্মণকে বাদশাহ্ 'রাজকবি' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। ইতিহাসে এই ব্যক্তিই বীরবল নামে পরিচিত। তিনি বাদশাহ্র খুবই প্রিয় ছিলেন। তাহারই সুপারিশে 'দেবী' নামক একজন হিন্দু দার্শনিক বাদশাহ্র সহিত মেলামেশা করার সুযোগ পায়। রাত্রিকালে বাদশাহ্র অন্দরমহলেও এই

দার্শনিকের অবাধ যাতায়াত ছিল। বাদশাহ্ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সর্বদা উদগ্রীব থাকিতেন। এই দেবী ও গৌতম নামে আর একজন ব্রাহ্মণের নিকট হইতে বাদশাহ্ মূর্তি, সূর্য ও আগুন পূজার নিয়মাবলী এবং ব্রহ্মা, মহামায়া, বিষ্ণু, কৃষ্ণ ও মহাদেব পূজার কায়দা কানুন শুনিয়া বড়ই উৎফুল্ল হইতেন এবং এইসব গ্রহণও করিতেন।

ইহা ছাড়া এই ধর্মে আগুন, পানি, গাছ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এবং গাভী পূজা করা হইত। নক্ষত্র পূজার ব্যাপারেও বাদশাহ্ অত্যধিক বাড়াবাড়ি করিতেন।

হিন্দুদের পুনর্জন্মবাদের উপর বিশ্বাস করা ছিল এই ধর্মের প্রধান কর্তব্য। বাদশাহ্ নিজেও বিশ্বাস করিতেন যে, মৃত্যুর পর তিনিও পুনরায় অন্য কোন সিংহাসনে শান শওকতের সহিত আরোহণ করিবেন। ব্রাহ্মণগণ তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, শক্তিশালী বাদশাহ্র শরীরে আত্মার জন্ম হয় এবং কামেল মনীষীগণের আত্মা মৃত্যুর সময় মস্তকের তালু দিয়া বাহির হইয়া যায়। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি মস্তকের তালুর চুল কামাইয়া ফেলিতেন এবং মস্তকের চারিদিকে চুল রাখিয়া দিতেন।

বাদশাহ্ জৈন সাধুদের দ্বারাও যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। সাধু সঙ্গ লাভের পর হইতে তাঁহার নিকট সবসময় এমন কি ভ্রমণের সময়ও একজন জৈন সাধু থাকিত। হির বিজয় সূরী নামক এক সাধুকে তিনি 'জগৎগুরু' উপাধি দিয়াছিলেন। নন্দা বিজয় সূরী নামক একজন সাধুকে তিনি 'খশফহম' উপাধি দিয়াছিলেন। হির বিজয় সূরীকে খুশী করিবার জন্য তিনি ধর্মপর্ব 'পর্যুষণে' বার দিন জীব হত্যা নিষিদ্ধ করিবার ফরমান জারী করিয়াছিলেন। জৈন ধর্ম অনুযায়ী বাদশাহ্ নিজেও মাংস আহার করা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই বিষয়ে বাদশাহ্ স্বয়ং সূরীজিকে এক পত্র প্রেরণ করেন। উহাতে তিনি সূরীজি কর্তৃক কিরূপ প্রভাবান্বিত হন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রটি নিম্নরূপ:-

'আমি আপনার উপদেশ অনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে জীবহিংসা পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। তবে আমি আগের চেয়ে এখন অনেক কম মাংস আহার করি। আপনি হয়তো জানেন যে, আমি ফতেহপুর হইতে আজমীর পর্যন্ত রাজপথের পার্শ্বে প্রতি এক ক্রোশ পর পর একশত চৌদ্দটি স্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছি। ঐগুলি প্রায় ছত্রিশ হাজার হরিণের শিং দিয়া সজ্জিত করিয়াছি। ঐগুলি আমি নিজ হাতে শিকার করিয়াছিলাম। আমি এত জীবের প্রাণ সংহার করিয়াছি। আমার মতো পাপী কেহ নাই। ইহা ছাড়া প্রতিদিন নানা প্রকার জীবের মাংসসহ পাঁচশত চড়াই পাখীর জিহ্বা দ্বারা উদর পূর্তি করিতাম। ঐ কথা ভাবিতে গেলেও এখন আমি আতংকিত

হইয়া উঠি। আপনার শ্রীমুখের অমিয়বাণী আমাকে মাংসাহারে অরুচি আনিয়া দিয়াছে। এখন বৎসরে ছয় মাস বা ততোধিক সময় আমি মাংস আহার করি না।'

অগ্নিপূজকদের দ্বারাও বাদশাহ্ যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তাহার আদেশে দরবারের সম্মুখে সর্বক্ষণ অগ্নি প্রজ্জ্বলন করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ঘণ্টাধ্বনি প্রভৃতি গ্রহণ করা হয় খৃষ্টানদের নিকট হইতে। মোটকথা কেবল মাত্র ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্মই বাদশাহ্র চোখে সুন্দর মনে হইত। তাঁহার চোখে সর্বাপেক্ষা সুন্দর মনে হইত হিন্দুধর্ম। তাই তাহার নতুন ধর্ম দ্বীন-ই-ইলাহীর বেশীর ভাগ উপাদানই গৃহীত হইয়াছিল হিন্দুধর্ম হইতে এবং সঙ্গত কারণেই হিন্দু ও রাজপুতদের নিকটই এই অদ্ভুত ধর্ম সমাদর লাভ করিয়াছিল সব চাইতে বেশী। সম্ভবতঃ বাদশাহ্ আকবরও ইহাই কামনা করিয়াছিলেন।

দ্বীন-ই-ইলাহীর মূলমন্ত্র ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আকবারু খলিফাতুল্লাহ! যাহারা ধর্মে দাখিল হইত তাহাদিগকে এইরূপ শপথ বাক্য উচ্চারণ করিতে হইতঃ- 'আমি অমুকের পুত্র অমুক এতদিন বাপ-দাদাদের অনুকরণে ইসলাম ধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম এখন স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে পূর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া দ্বীন-ই-ইলাহী গ্রহণ করিতেছি এবং এই ধর্মের জন্য জীবন, সম্পদ ও সম্মান বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছি।'

দ্বীন-ই-ইলাহীর অনুসারীরা চিঠিপত্রের শিরনামায় 'আল্লাহ্ আকবর' লিখিত এবং পরস্পরের সাক্ষাতের সময় সালামের পরিবর্তে একজন বলিত 'আল্লাহ্ আকবর' এবং অপরজন বলিত 'জাল্লা জালালুহু'। বাদশাহ্ তাহাদিগকে শিজরা স্বরূপ একখানি প্রতিকৃতি প্রদান করিতেন। তাহারা বাদশাহ্র এই প্রতিকৃতিটি পরম শ্রদ্ধাভরে নিজ নিজ পাগড়ীতে বসাইয়া রাখিত।

বাদশাহ্ যে সব পূজাপার্বণ করিতেন অনুসারীগণকেও সেই সব করিতে হইত। উপরন্তু তাহাদেরকে বাদশাহ্কে সেজদাও করিতে হইত। ভণ্ড সুফীদের সর্দার তাজুল আরেফিন বাদশাহ্কে সেজদা করা ওয়াজেব বলিয়া ফতোয়া দান করেন। এই সেজ্দার নামকরণ করা হয় 'জমিন বোছ।' তিনি বলেন, বাদশাহ্র প্রতি আদব প্রদর্শন করা ফরজে আইন এবং তাহার চেহারা কেবলায়ে হাজত ও কাবায়ে মুরাদ। কতকগুলি দুর্বল রেওয়ায়েত এবং হিন্দুস্থানের ভ্রষ্ট সুফীদের কার্যপ্রণালী দলিলরূপে খাড়া করিয়া তিনি ইহার ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

সাধারণ ব্যক্তি ছাড়াও বিশিষ্ট আলেমগণও এই শেরেকি কার্যে অভ্যস্ত ছিলেন। তাহারাও বাদশাহ্কে সেজদা করিতেন। সেজদাই ছিল শাহী দরবারের প্রধান আদব।

এই নতুন ধর্মে সুদ ও জুয়া ছিল হালাল। খাছ দরবারে জুয়া খেলার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা হয় এবং জুয়াড়ীদিগকে রাজকোষ হইতে সুদি কর্জ দেওয়ার

ব্যবস্থা করা হয়। মদ্যপান করা হালাল সাব্যস্ত করা হয়। বাদশাহ্ স্বয়ং দরবারের নিকটে একটি শরাবখানা খুলিয়া দেন। নওরোজ অনুষ্ঠানে অধিকাংশ আলেম, কাজী ও মুফতিগণকে শরাব পান করিতে বাধ্য করা হইত। এই সব অনুষ্ঠানে বিভিন্ন লোকের নামে পেয়ালা নির্বাচিত হইত। ফৈজি বলিতেন, 'আমি এই পেয়ালাটি পান করিতেছি ফকিহদের অন্ধ বিশ্বাসের নামে।'

এই ধর্মে দাড়ি মুণ্ডনের ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হইত। বাদশাহ্ এই ব্যাপারে রাজপুত পত্নীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন।

নাপাকীর জন্য গোসল করা ইসলামে ফরজ। কিন্তু বাদশাহ্ আকবরের ধর্মে ইহার বিপরীত মত প্রকাশ করা হয়। বলা হয় যে, 'মনী' উৎকৃষ্ট মানুষ সৃষ্টির বীজ। তাই গোসল করিয়া সহবাস করাই উত্তম। ইহা ছাড়া বিবাহ সম্পর্কে আইন করা হয়– কেহ তাহার চাচাত, মামাত, ফুফাত ইত্যাদি সম্পর্কের বোনকে বিবাহ করিতে পারিবে না। ষোল বৎসর বয়সের পূর্বে বালক এবং চৌদ্দ বৎসর বয়সের পূর্বে বালিকাদের বিবাহ দেওয়া চলিবে না এবং কেহ একাধিক বিবাহ করিতে পারিবে না।

যুবতী নারীদের বাধ্যতামূলকভাবে চেহারা খোলা রাখিয়া পথ চলা ছিল এই নতুন ধর্মের আইন। ব্যাভিচারও ছিল আইন সঙ্গত। সেই জন্য শহরের বাহিরে পতিতাদের বসতি স্থাপন করা হয় এবং এই সবের নাম দেওয়া হয় 'শয়তানপুর'। এই সব স্থানে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়।

বার বৎসর বয়সের পূর্বে বালকদের খৎনা করা ছিল নিষিদ্ধ। খৎনারূপ সুন্নতকে মিটাইয়া দিবার জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল।

মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে এই বিধান জারী হয় যে– এই ধর্মাবলম্বী কোন লোকের মৃত্যু হইলে তাহার গলায় কাঁচা গম ও পাকা ইট বাঁধিয়া তাহাকে পানিতে নিক্ষেপ করিতে হইবে এবং যেখানে পানি পাওয়া যাইবে না সেখানে মৃতদেহ জ্বালাইয়া দিতে হইবে অথবা পূর্ব দিকে মাথা ও পশ্চিম দিকে পা করিয়া দাফন করিতে হইবে।

একদিন আবুল ফজল বাদশাহ্‌কে একখানি কেতাব দেখাইয়া বলিলেন, 'আপনার জন্য ইহা ফেরেশতা আসমান হইতে আনিয়াছে।' সেই কেতাবের একস্থানে একটি আরবী বাক্য লিখিত ছিল যাহার অর্থ এইরূপঃ

'হে মানুষ তুমি গাভী হত্যা করিও না। যদি কর তবে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হইবে।' নিরক্ষর বাদশাহ্ ইহা বিশ্বাস করিলেন এবং গরু জবেহ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কানুন জারী করিলেন, কসাই এর সহিত কেহ আহার করিলে তাহার হাত কাটিয়া দেওয়া হইবে। এমনকি তাহার স্ত্রীও যদি তাহার সহিত আহার করে তবে তাহার আঙ্গুল কাটিয়া দিতে হইবে। এই নতুন ধর্মে গরু, উট, ভেড়া

প্রভৃতি জানোয়ারের গোশ্‌ত হারাম বলিয়া ঘোষিত হয়। পক্ষান্তরে বাঘ ভালুকের গোশ্‌ত হালালের মর্যাদা লাভ করে। মোট কথা সর্বক্ষেত্রে ইসলামের বিরোধিতা করাই ছিল দ্বীন-ই-ইলাহীর মূল উদ্দেশ্য।

একদিন বাদশাহ্‌ আকবর সভাসদগণকে ডাকিয়া বলিলেন, 'হিন্দুস্তানের জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান যোগীঋষিদের লিখিত হিন্দি ভাষার পুস্তকগুলি নির্ভুল জ্ঞানের উৎস। আমরা যদি এইগুলি ফারসী ভাষায় অনুবাদ করিয়া লই তাহা হইলে আমাদের ইহকাল ও পরকালে শান্তি লাভ হইবে।'

তৎক্ষণাৎ বাদশাহ্‌র বাসনা পূরণ করিবার ব্যবস্থা করা হইল। অনুবাদ কার্যের জন্য অনেক আলেম নিয়োজিত করা হইল এবং ইহার জন্য পৃথক দফতর কায়েম করা হইল। সঙ্গে সঙ্গে আরবী পড়া ও আরবী জানা অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হইল। ইহার বদলে জ্যোতিষ শাস্ত্র, অংক, চিকিৎসা, ইতিহাস ও কথা কাহিনী প্রভৃতি পুস্তকের প্রচলন করা হইল।

ইহার পর বাদশাহ্‌ আকবর হিন্দুদের উপর হইতে কয়েক কোটি টাকার জিজিয়া কর উঠাইয়া লইলেন। পূর্বে যাহারা 'এলমে ফেকাহ্‌' শিক্ষাদান করিতেন তাঁহাদেরকে একশত বিঘা জমি জায়গীরস্বরূপ দেওয়া হইত। বাদশাহ্‌ আকবর এই জায়গীর ছিনাইয়া লইলেন। ইসলামী আইন অনুযায়ী বিচার করিবার জন্য কাজী নিযুক্ত করা হইত। জায়গীর প্রথা বন্ধ করার ফলে ইসলামী বিচার ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করা হইল। এমনি করিয়া ইসলামী হুকুমতের শেষ চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত করিবার জন্য বাদশাহ্‌ আকবর তাঁহার সর্বশক্তি প্রয়োগ করিলেন। ফলে কয়েক বছরের মধ্যে হুকুমতের কোন ক্ষেত্রেই আর ইসলামের চিহ্ন অবশিষ্ট রহিল না। মসজিদ বিরাণ হইল। মাদ্রাসা ধ্বংস হইল। অধিকাংশ আলেম দেশ ত্যাগে বাধ্য হইলেন।

মাদারেছ আজ উলামা অচুঁনা বুদ খালি
কে মাহে রোজা যে মায়খার খানা খুম্মার
ব্যরান্দ তখতায়ে লৌহে আদীব আজ পায়ে নারদ
কুনান্দ মছফাহে ক্বারী গিরব্‌ বঅজহে ক্বেমার

মাদ্রাসা যত হয়ে গেল খালি উলামা বিহনে হায়।
যেন-শরাব নাই, শরাবীও নাই রমজানের শরাবখানায়।
ক্বারীর কোরআন জুয়ার কারণে হয়ে গেল বন্ধক—
পাঠের তখতি হলো জুয়ার তখতা-কি নিদারুণ শোক।

শেষ পর্যন্ত বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বে এমন এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল যাহাতে সুন্নি মুসলমানগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। কারণ একমাত্র সুন্নি মুসলমানগণ ব্যতীত অন্য সব সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিল বাদশাহ্র প্রিয়। কাফেররা সম্মানিত হইল, মুসলমানগণ হইলেন অপদস্থ। ইসলামী আহকাম পালন করিতে গিয়া তাঁহারা প্রতিটি ক্ষেত্রে কাফেরদের বিদ্রূপবানে জর্জরিত হইতে লাগিলেন।

হিন্দুরা একাদশীর দিন উপবাস থাকে। তাই সেই দিন মুসলমানগণকেও উপবাস করিতে বাধ্য করা হইত। অথচ রমজান মাসে কাফেররা অবাধে খাদ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করিত ও প্রকাশ্যে আহার করিত। স্বয়ং বাদশাহ্ যাহাদের সহায় তাহাদের বিরুদ্ধে শাহী অনুকম্পা ও পৃষ্ঠপোষকতা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত মুসলমানগণ কি-ই বা করিতে পারেন। তাঁহারা অন্তরে অন্তরে দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন। আল্লাহ্পাকের তরফ হইতে সাহায্য আসিবার প্রতীক্ষায় থাকা ছাড়া তাঁহারা আর করণীয় কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না। একজন মোজাদ্দেদের প্রতীক্ষা করিতে করিতে তাঁহারা ধৈর্যের শেষ সীমানায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

নেগাহেঁ লাগ বহেঁ নূরে হক কব জলওয়াগার হোগা
খোলেগা ইয়া এলাহী অহ্ দরওয়াজা এনায়েত কা
কতদিন পর আসিবে সেই সত্য নূর—
ইয়া এলাহী রহমত তোমার আর কতদূর?

হজরত সেলিম চিশতি র. এর পুত্র মাওলানা বদরউদ্দিন ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। বিশিষ্ট দরবারীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বাদশাহ্র এই সব কুফরী আকিদা ও রসমের বিরোধিতা করিলেন। প্রতিবাদস্বরূপ তিনি সরকারী চাকুরী হইতে ইস্তফা দিলেন। বাদশাহ্ তাঁহাকে দেওয়ানে খাসে ডাকিয়া লইয়া অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু তিনি স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল রহিলেন। হুকুমতের তরফ হইতে তাঁহার প্রতি কঠোরতা আরোপিত হইল। কঠোরতা চরমে উঠিলে তিনি নীরবে হজ করিতে চলিয়া গেলেন।

বঙ্গদেশ ও বিহারের মুসলমানগণের নিকট যখন বাদশাহ্ আকবরের এই পথভ্রষ্টতার সংবাদ পৌঁছিল তখন তাহারাও অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তাহারা এই বিরাট ফেতনায় শংকিত হইয়া হক্কানী আলেমগণের শরণাপন্ন হইলেন। কাজী মোহাম্মদ ইয়াজদি ছিলেন জৌনপুরের অধিবাসী। তিনি ফতোয়া জারী করিলেন, ‘বাদশাহ্ আকবরের কার্যকলাপ হিন্দুস্তানে ইসলাম বিপন্ন করিতেছে। সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ন্যায়সঙ্গত।’

কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত মোঘল সাম্রাজ্যে এই সব কর্মসূচী তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। শতকরা পঁচানব্বই জন দেশবাসী হিন্দু। তাহারা সবাই বাদশাহ্‌র পক্ষে। ইহা ছাড়া দুনিয়াদার আলেম, ভণ্ড সূফীকুল, শিয়া প্রভৃতি গোষ্ঠীও বাদশাহ্‌র হস্তকে শক্তিশালী করিয়াছে। জৈন, পারসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদেরও রহিয়াছে বাদশাহ্‌র প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন। সুতরাং বাদশাহ্ নির্বিঘ্নে ইসলামবিরোধী শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া যাইতে লাগিলেন।

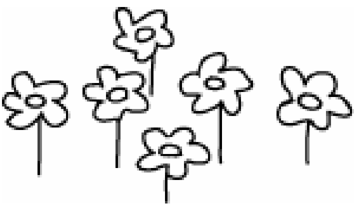

সমগ্র হিন্দুস্তানে ইসলামের এই ঘোর দুর্দিনে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি শায়েখ আহমদ ফারূকী সেরহিন্দি র. তাঁহার মোজাদ্দেদসুলভ প্রজ্ঞা ও দৃঢ়সংকল্প লইয়া সংস্কারের কার্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বেদাত ও কুফরীর যাঁতাকলে পিষ্ট ইসলামের ভয়াবহ দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার ফারূকী রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। গভীরভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া তিনি সিদ্ধান্তে আসিলেন যে, সর্বপ্রথম বাদশাহের এসলাহ্ হওয়া প্রয়োজন। কারণ বাদশাহ্ রূহ এবং জনগণ শরীর তুল্য। রূহের ব্যাধি দূরীভূত হইলে শরীরও ব্যাধিমুক্ত হইবে। কিন্তু বাদশাহ্‌র এসলাহের পূর্বে আমির ওমরাহগণের এসলাহ হওয়া প্রয়োজন। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. সর্বপ্রথম সেইদিকেই মনোনিবেশ করিলেন।

খান খানান, খানে আজম, সৈয়দ ছদরে জাহান, মোর্তজা খান, মহব্বত খান প্রমুখ ওমরাহ্ পূর্ব হইতেই হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মুরিদ ছিলেন। তিনি তাঁহাদের দ্বারা বাদশাহ্ আকবরকে এইসব কুফরী কার্যকলাপ হইতে তওবা করিবার জন্য আহ্বান জানাইলেন। তিনি ওমরাহগণকে নির্দেশ দিলেন– 'তোমরা বাদশাহ্‌কে আমার পক্ষ হইতে বলিয়া দাও যে, বাদশাহী ক্ষণস্থায়ী। এইসব আড়ম্বর চিরদিন থাকিবে না। দুই দিনের চাকচিক্যের মোহে সত্যকে অস্বীকার করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সুতরাং অবিলম্বে এইসব কুফরী কার্য হইতে তওবা করিয়া চিরনিরাপত্তার ধর্ম ইসলামের সুশীতল পুষ্পশোভিত বাগিচায় আগমন করা উচিত। নতুবা গজব আসিবে। আল্লাহ্‌পাকের গজব হইতে বাঁচাইবার সাধ্য কাহারও নাই। আল্লাহ্‌পাক সর্বশক্তিমান। বাদশাহীর পরওয়া তিনি করেন না। ফেরাউন, নমরূদ

প্রমুখ প্রবল পরাক্রমশালী বাদশাহ্‌গণও আল্লাহ্‌র গজবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সেই গজব হইতে কেহই তাহাদেরকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হয় নাই।'

মোর্শেদের কথামতো ওমারাহ্‌গণও বাদশাহ্ আকবরকে নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। শেরেখ, কুফরীর প্রভাবে তাহার অন্তর পাষাণ হইয়া গিয়াছে। হেদায়েতের নূর সেখানে প্রবেশ করিতে পারিল না। বাদশাহ্ স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল রহিলেন।

একদিন বাদশাহ্ একটি অশুভ স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্ন তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। রাজ্যের সমস্ত স্বপ্ন ব্যাখ্যাবিদ ও জ্যোতিষগণকে তিনি স্বপ্নটির বিষয়বস্তু জানাইলেন এবং উহার অর্থ জানিতে চাহিলেন। তাহারা বাদশাহ্‌কে জানাইলেন, 'এই স্বপ্নের অর্থ হইতেছে এই যে, বাদশাহ্‌র পতন অতি সন্নিকটে।' বাদশাহ্ ইহা শুনিয়া ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি দমিয়া গেলেন। নতুন করিয়া ফরমান জারী করা হইল যে– পূর্বে দ্বীন-ই-ইলাহী পালনের ব্যাপারে যে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হইত– এখন হইতে উহা থাকিবে না। যাহারা সেজদা করিতে ইচ্ছুক নয়– তাহাদিগকে বাদশাহ্‌র তরফ হইতে সেজদা করিবার জন্য জবরদস্তি করা হইবে না।

কিছুদিন পর বাদশাহ্ আকবর এক উৎসবের আয়োজন করিলেন। উৎসবে দুইটি দরবার নির্মিত হইল। একটির নাম রাখা হইল 'আকবরী দরবার'এবং অপরটির নাম রাখা হইল 'মোহাম্মদী দরবার।' আকবরী দরবার প্রস্তুত করা হইল বহু অর্থ ব্যয়ে। চোখ ঝলসানো আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করা হইল। সুসজ্জিত মনোরম মঞ্চ নির্মিত হইল। নিমন্ত্রিত অতিথিদের উপবেশনের জন্য প্রস্তুত করা হইল জৌলুসময় গালিচা। পুষ্পের সৌরভ, আতরের সুঘ্রাণে আকবরী দরবার পরিণত হইল ছোটখাট শাদ্দাদের বেহেশতে। শাহী খানার ব্যবস্থা করা হইল।

অপরদিকে মোহাম্মদী দরবারের অবস্থা ছিল বড়ই করুণ। ছিন্ন তাঁবু, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ফরাস দিয়া নির্মিত হইল এই দরবার। খাবারের ব্যবস্থা করা হইল নিকৃষ্ট মানের। আলোক সজ্জার ব্যবস্থা নাই। নিতান্ত মামুলী সাধারণভাবে নির্মিত এই দরবারটিকে আকবরী দরবারের নিকটে জীর্ণশীর্ণ কুঁড়েঘর মনে হইতে লাগিল।

এইরূপ করার মূলে বাদশাহ্ আকবরের উদ্দেশ্য ছিল এই যে– মানুষ দেখুক জানুক যে, ইসলামের কার্যকারিতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। জীর্ণ-শীর্ণ এই ধর্ম বর্তমান যুগে অচল। দ্বীন-ই-ইলাহীই শান-শওকতময় ও যুগোপযোগী ধর্ম। এখন আর কাহারও এ বিষয়ে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। মনে প্রাণে সবারই নতুন ধর্মে দাখিল হওয়া উচিৎ।

কিন্তু বাদশাহ্ বুঝিলেন না যে, সত্য চিরদিনই সত্য। সত্য কোনদিনই যুগের অধীনে নয়। সত্য চিরন্তন। অতীতকাল, বর্তমানকাল, ভবিষ্যৎকাল– সব মিলিয়া

বরং সবারই ঊর্ধ্বে মহাকাল। মহাকাল একই কাল। মহাসত্য একই সত্য। খণ্ডিত আকারে সীমাবদ্ধরূপে কখনও সত্যের স্বরূপ প্রকাশিত হইতে পারে না। যুগ আসিবে, যুগ চলিয়া যাইবে। পার্থিব উপকরণাদিতে সূচিত হইবে বিভিন্নমুখী পরিবর্তন। কিন্তু সেই পরিবর্তনে সত্যের পরিবর্তন হইবে না। সত্য যে চিরন্তন। ইসলাম সেই সত্যের ধর্ম। যুগের সীমিত দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ইসলামকে বিচার করা বিভ্রান্তি।

উৎসবের দিন আসিল। নির্দিষ্ট সময়ে বাদশাহ্ আকবর তাহার পরিষদবর্গ, আমির ওমরাহ ও বিশিষ্ট অতিথিগণকে সঙ্গে লইয়া মহাসমারোহে তাঁবুতে প্রবেশ করিলেন। লোভী দুনিয়াদার লোকেরাও তাহার অনুসরণ করিল। আনন্দ উল্লাসে মুখরিত হইয়া উঠিল 'আকবরী দরবার।'

এমন সময় হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. তাঁহার মুরিদানসহ আগমন করিলেন। তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না, কি উদ্দেশ্যে এই উৎসবের আয়োজন এবং কেনইবা এই দুই দরবারের সাজসজ্জার মধ্যে এইরূপ আকাশ পাতাল ব্যবধান। মুসলমানদের অপদস্থ ও কোনঠাসা করা ছাড়া এই সব অর্থহীন কার্যকলাপের আর যে কোনই উদ্দেশ্য নাই– তাহা তাঁহার অবিদিত রহিল না। কিন্তু মান-সম্মান ইজ্জত নিজের অর্জিত সম্পদ নয়। ইহা আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামত। তিনি যাহাকে খুশী ইহা দান করেন।

হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁহার মুরিদান ও কিছু দরিদ্র মুসলমানসহ মোহাম্মদী দরবারে প্রবেশ করিলেন। আহারের সময় হইল। এমন সময় হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁহার এক মুরিদের হাতে লাঠি দিয়া বলিলেন, 'যাও এই লাঠি দিয়া তুমি মোহাম্মদী দরবারের চতুর্দিকে একটি বৃত্তাকার আঁক দিয়া আস।' উক্ত মুরিদ তাঁহার কথামত লাঠি দিয়া দরবারের চতুর্দিকে বৃত্তাকার দাগ দিয়া ফিরিয়া আসিলে তিনি তাঁহার হাতে এক মুষ্ঠি ধূলি দিলেন এবং বলিলেন– 'এইবার বাহিরে গিয়া এই ধূলি আকবরী দরবারের দিকে ছুঁড়িয়া মার।' মুরিদ আকবরী দরবারের দিকে ধূলি ছুঁড়িয়া মারিলেন।

মুহূর্ত মধ্যে প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ভয়ঙ্কর তুফান শুরু হইয়া আকবরী দরবারকে ঘিরিয়া ফেলিল। দরবারে মহা ধুমধাম চলিতেছিল। হঠাৎ তুফান দেখিয়া সবাই ভয় পাইয়া গেল। কি করিবে বুঝিয়া উঠিবার আগেই তাঁবু উড়িয়া গেল। আসবাবপত্র, সাজসজ্জা, খাদ্য সামগ্রী সমস্তই তছনছ হইয়া গেল। নিমন্ত্রিত অতিথিগণ একে অন্যের উপরে পড়িয়া ধস্তাধস্তি শুরু করিল। তুফানে তাঁবুর খুঁটিগুলি উপড়াইয়া উঠিয়া তাহাদের মস্তকে আঘাত করিতে শুরু করিল। একটি খুঁটি উপড়াইয়া গিয়া বাদশাহ্র মস্তকে পর পর সাতটি আঘাত করিল।

পাশেই মোহাম্মদী দরবার। আল্লাহ্পাকের কি অপার মহিমা। মোহাম্মদী দরবারে তুফান এতটুকুও স্পর্শ করিল না। দরবারের সবাই হজরত মোজাদ্দেদ র. এর এই কারামত দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহারা সবাই আল্লাহ্পাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করিলেন।

মস্তকে সাতটি আঘাত খাইয়া বাদশাহ্ শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। তিনি শয্যা হইতে আর উঠিতে পারিলেন না। আঘাত বড়ই মারাত্মক হইয়াছিল। কয়েকদিন পরেই বাদশাহ্ মৃত্যুবরণ করিলেন।

সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর বাদশাহ্ আকবর মৃত্যুবরণ করিলেন। দিল্লীর মসনদে সমাসীন হইলেন পুত্র জাহাঙ্গীর। কিন্তু আকবর তাহার জীবদ্দশায় হুকুমতের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং রাজ্যব্যাপী দ্বীন-ই-ইলাহীর বাতিল মতবাদের যে প্রভাব রাখিয়া গিয়াছিলেন বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না। জাহাঙ্গীরের যৌবনকাল এই বাতিল ধর্মের পরিবেশেই অতিবাহিত হইয়াছিল। হিন্দু ব্রাহ্মণ, যোগীদের সাহচর্য ও পিতার ধর্মমতের প্রভাব তাহাকে ইসলাম সম্পর্কে উদাসীন করিয়া দিয়াছিল। ফলে আকবর মরিল ঠিকই কিন্তু হুকুমতে কুফরী রসমের কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটিল না।

জাহাঙ্গীর ছিল দ্বীন-ই-ইলাহীর একনিষ্ঠ মুরিদ। তাহার পিতার নাম উচ্চারণের পূর্বে তিনি 'আমার মোর্শেদ' শব্দ উচ্চারণ করিতেন। তিনি বলিতেন, 'আমার মোর্শেদ বুজর্গ ছিলেন বহুবিধ প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী। তাহার গুণাবলী সম্পর্কে যদি কোন বিরাটকায় পুস্তক রচনা করা যায় তবুও তাহার গুণাবলীর সামান্যতম অংশও বর্ণনা করা সম্ভব হইবে না। অজস্র ধন-সম্পদ, হস্তী-অশ্ব, সৈন্যসামন্ত ও বিশাল পরাক্রমের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ্র দরবারে বড়ই দীনতা ও হীনতা প্রকাশ করিতেন।

আমার ওয়ালেদ বিভিন্ন ধর্মে জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণের সাহচর্য বড়ই পছন্দ করিতেন। বিশেষ করিয়া হিন্দু ধর্মের পণ্ডিতগণের সাহচর্য ছিল তাঁহার অত্যধিক পছন্দনীয়। তিনি সূর্য ও বিভিন্ন দেবতার পূজা করিতেন। এই সব করায় কি দ্বীনে মোহাম্মদীর সহিত তাঁহার শত্রুতা ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়?

জাহাঙ্গীরের আকিদা বিশ্বাস ছিল এইরূপ। তিনিও তাঁহার পিতার মত মনে করিতেন যে, বিবেক যাহা ভাল বলিয়া গ্রহণ করিবে সেই অনুযায়ী আল্লাহ্পাকের ইবাদত বন্দেগী করিলেই চলিবে। হায় আফসোস, এইসব যে পূরাপুরি নফসানিয়াত তাহা বুঝবার ক্ষমতা বাদশাহের ছিল না। নফসে আম্মারা কোনদিনই সত্য আবিষ্কারের ক্ষমতা রাখে না। কারণ সে নিজেই বিশুদ্ধতার মুখাপেক্ষী। এই জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে শরীয়ত। শরীয়তের অনুগত না হওয়া পর্যন্ত নফসের সাফাই হওয়া সম্ভব নহে। যতখানি শরীয়ত প্রতিপালিত হইবে ততখানি নফসের কু-স্বভাব দূর হইবে। সেই কারণেই আল্লাহ্পাক আমাদেরকে নফসের সহিত বিরোধিতা করিবার হুকুম করিয়াছেন। কারণ সে নিজের প্রতিপালকের বিরোধিতা করে। কিন্তু আকবরের ন্যায় জাহাঙ্গীরও ভুল করিলেন। তিনিও বুঝিলেন না যে– একমাত্র হজরত নবীয়ে করিম স. এর অনুসরণ করার প্রতিই দো-জাহানের সৌভাগ্য নির্ভরশীল।

খেলাফে পয়গম্বর কাছেরা গজিদ
কে হরগিজ বা মনজেল না খাহাদ রাছিদ।

যে পথিক চলে না পথ নবীদের পথে,
পড়ে রয় সে বহুদূর মনজিল হতে।

মানুষ বদল হইল। কিন্তু আদর্শ বদল হইল না। জাহাঙ্গীর তাহার পিতার মত মুরিদ করিতে লাগিলেন। তিনি সূর্যকে বড়ই সম্মান করিতেন এবং পরম শ্রদ্ধাভরে সশব্দে সূর্যের নাম উচ্চারণ করিতেন। সমস্ত কার্যের উপর নক্ষত্রের প্রভাব আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন এবং মনে করিতেন নক্ষত্রসমূহ– নূরে এলাহীর বিকাশস্থল। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাহার সভার প্রধান জ্যোতিষ ছিলেন কৃষ্ণদৈবজ্ঞ। বিশেষ বিশেষ কার্য করিবার পূর্বে তিনি জ্যোতিষদের পরামর্শ অনুযায়ী শুভক্ষণ এবং শুভলক্ষণ এর প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন।

তিনি তাঁহার মুরিদগণকে উপদেশ দিতেন, 'কোন ধর্মের প্রতি শত্রুতা করিয়া নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করিও না। যুদ্ধের সময় এবং শিকারের সময় ব্যতীত কোন জীবকে নিজ হাতে বধ করিও না। নক্ষত্রসমূহকে সম্মান করিও। কেননা ঐসব আল্লাহর নূরের বিকাশ স্থল এবং ঘটনা ও অবস্থার উপর একমাত্র আল্লাহ্রই প্রভাব আছে মনে করিও।'

বাদশাহ্ মনে করিতেন, যেহেতু তিনি হিন্দু মুসলমান সকল জাতির বাদশাহ্ সুতরাং সব ধর্মের প্রতিই তাহার সমান পৃষ্ঠপোষকতা থাকা উচিৎ। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি যেরূপ হিন্দু সাধুদিগকে সম্মান করিতেন তেমনি মুসলমান পীর ফকিরদিগের প্রতিও ভক্তি রাখিতেন। তাহার এই আপোষমূলক নীতির ফলে কাফেরদের প্রভাবতো বিন্দুমাত্রও কমিল না বরঞ্চ আরও বাড়িয়া গেল।

জাহাঙ্গীর সিংহাসনে উপবেশন করিয়া পিতার আমলের আমির ওমারাহ্গণকে তাহাদের স্ব স্ব পদে বহাল রাখিলেন। ফলে শাহী দরবারে হিন্দুদের প্রভাব বিন্দুমাত্রও কমিল না। কারণ আকবরের আমল হইতে তাহারা বড় বড় পদ দখল করিয়াছিলেন। ফলে রহিত জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তিত হইল না। গরু জবেহ্ বন্ধের হুকুম রহিত হইল না। বাদশাহ্ দুনিয়াদার আলেম এবং ভণ্ড সূফীদের কার্যকলাপের প্রতি উদাসীন রহিলেন। ফলে পরিস্থিতি এমন আকার ধারণ করিল যে, প্রকৃত ইসলামের নিশানা সমগ্র দেশ হইতে মুছিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

ইহার উপর যোগ হইল নতুন আর এক ফেতনা। এই ফেতনার মূল নায়িকা হইলেন জাহাঙ্গীরের বেগম নূরজাহান। নূরজাহান ছিলেন শিয়া। শিয়া মতাবলম্বীদের কেন্দ্র হইল ইরান। বাদশাহ্ হুমায়ুন ইরানের সুলতানের সহায়তায় শেরশাহের হাত হইতে দিল্লীর মসনদ পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। তখন হইতে শিয়াদের এক বিরাট দল হিন্দুস্থানে আসিয়া বসবাস করিতে থাকে এবং শাহী অনুকম্পায় হুকুমতের অনেক বিশিষ্ট পদ দখল করিতে থাকে।

জাহাঙ্গীর ছিলেন আশেক মেজাজের মানুষ। তিনি নূরজাহানকে অত্যধিক ভালবাসিতেন। নূরজাহান ছিলেন অতিশয় বুদ্ধিমতি। জাহাঙ্গীরের দুর্বলতার সুযোগ নিয়া ক্রমে ক্রমে নুরজাহান বাদশাহ্ ও বাদশাহীর উপর একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলিলেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়া গেল যে, জাহাঙ্গীর কেবল নামমাত্র বাদশাহ্ রহিলেন। প্রকৃত ক্ষমতা চলিয়া গেল নূরজাহানের হাতে। বাদশাহ্ স্বয়ং বলিতেন, 'আমার বাদশাহী এখন নুরজাহান ও তাহার দলের হাতে। আর আমি এক সের শরাব আর আধাসের গোশত পাইলেই খুশী।'

নূরজাহানের নানা ছিলেন ইরানের উজির। নূরজাহানের এইরূপ প্রভাব প্রতিপত্তির সংবাদ তাহার নিকট পৌঁছিল। উজির সাহেব ছিলেন বিখ্যাত শিয়া নেতা। শিয়াগণ সুন্নি মুসলমানদের প্রতি চরম শত্রুতা ভাব পোষণ করিত। নূরজাহানের সাহায্যে তাহারা হিন্দুস্তানের সুন্নি মুসলমানদের কোণঠাসা করিবার পরিকল্পনা করিল এবং সফলও হইল। নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খান হইলেন বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের উজির। শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত নূরুল্লা শূছতরীকে প্রধান কাজী নিযুক্ত করা হইল। এই কাজী সাহেব সুন্নি মুসলমানদের প্রতি অত্যধিক বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. পরিবর্তিত পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া সংস্কারের নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবার বিষয়ে চিন্তা শুরু করিলেন। পরিস্থিতি ভয়াবহ। আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি কাহারো লক্ষ্য নাই। রসূল স. এর প্রদর্শিত সিরাত্বল মুস্তাকিমের উপর চলিবার কাহারো আগ্রহ নাই। গতানুগতিক নফসানিয়াত আর শয়তানী স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া সবাই অমূল্য সময় বৃথা অতিবাহিত করিতেছে। মোঘল হুকুমত এই শয়তানী ধ্যান-ধারণার পৃষ্ঠপোষক।

মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. হুকুমত হইতে এই শয়তানী শক্তি নির্মূল করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। বাদশাহ্ বদল করিলে কাজ হইবে না। বাদশাহ্র এসলাহ্ করিতে হইবে। তাহার জন্য সর্বপ্রথমে এসলাহ করিতে হইবে হুকুমতের আমির ওমরাহগণের। কারণ তাহাদের এসলাহ ব্যতিরেকে বাদশাহের এসলাহ স্থায়ী হইবে না। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাই ইসলামী আইন-কানুন আকিদা বিশ্বাস এর প্রতি উৎসাহিত করিবার জন্য খানে আজম, লালাবেগ, খান জাহান, কলীজ খান, শায়েখ ফরিদ প্রমুখ দরবারীদিগের সহিত যোগাযোগ করিলেন।

তিনি শায়েখ ফরিদের নিকট লিখিলেন......'দেহের মধ্যে আত্মা যেরূপ– বাদশাহ্ জনসাধারণের মধ্যে সেইরূপ। অন্তর পবিত্র থাকিলে দেহও পবিত্র থাকে। অন্তর অপবিত্র হইলে দেহও অপবিত্র হয়। যেমন বাদশাহ্ আদর্শবান হইলে দেশবাসীও আদর্শবান হয় এবং বাদশাহ্র আদর্শচ্যুতির কারণে দেশবাসীদের আদর্শচ্যুতি ঘটে।

আপনি জানেন, পূর্ববর্তী জামানায় মুসলমানগণ কতইনা দুরবস্থার মধ্য দিয়া দিনাতিপাত করিয়াছেন। ইসলামের প্রথম অবস্থায় মুসলমানগণ নগণ্য সংখ্যক থাকা সত্ত্বেও এইরূপ দুরবস্থার সম্মুখীন হন নাই। মুসলমানগণ নিজধর্ম পালন করিত। আল্লাহ্পাক ফরমাইছেন, 'লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়াদীন'– অর্থাৎ 'তোমাদের ধর্ম তোমাদের এবং আমাদের ধর্ম আমাদের।' কিন্তু কিছুকাল পূর্বে বেদীনগণ প্রকাশ্যে দৃঢ়তার সহিত ইসলামী রাষ্ট্রে তাহাদের ধর্মের হুকুম প্রচার করিত– কিন্তু মুসলমানগণ তাঁহাদের ধর্ম প্রচার করিবার ক্ষমতা রাখিতেন না। এমনকি এইরূপ করিলে তাঁহাদিগকে হত্যা করা হইত। আহা-কি আফসোস! কি সর্বনাশ! কি বিপদ! কি কষ্ট!

....বাহ্যিকভাবে যে ব্যক্তি ইসলামের সর্বপ্রকার সাহায্য করিবার ক্ষমতাধারী– তাঁহার অলসতার কারণে যদি ইসলাম দুর্বল হইয়া পড়ে তবে আল্লাহ্পাকের নিকট তাঁহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে। এই নিকৃষ্ট নিঃসহায় ফকিরও ইসলামের সাহায্যকারীদের দলভূক্ত হইবার আশা রাখে। সেই কারণে এই পত্র লিপিবদ্ধ হইল।

'যে যেই দল বর্ধিতকরণের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে-সে সেই দলভুক্ত' এই বাক্য মোতাবেক এই সহায় সম্বলহীনকেও উক্ত মহাজনদের দলভুক্ত করা হইবে বলিয়া বাসনা রাখি। হজরত ইউসুফ আ.কে ক্রয় করিবার জন্য বৃদ্ধা যেরকম তাহার শেষ সম্বল শুধুমাত্র সুতার মুঠা লইয়া গিয়াছিল– আমিও নিজেকে সেই রকম মনে করিতেছি। কিছুদিনের মধ্যেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশা রাখি। আমার বিশ্বাস আপনি যখন বাদশাহ্র অতি নৈকট্য অর্জন করিয়াছেন, তখন বাদশাহ্র সহিত শরীয়ত প্রচার সম্পর্কে সরাসরি আলোচনা করিবেন এবং মুসলমানগণকে এইরূপ অপমানজনক পরিস্থিতি হইতে মুক্ত করিবেন।'

মানুষ স্বভাবতই অস্থির। কোন কার্যেই তাহার উৎসাহ সমানভাবে বিদ্যমান থাকে না। বিশেষ করিয়া সৎকাজে। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাহা ভাল করিয়াই জানিতেন। তাই তিনি দরবারীদিগের সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেন এবং উৎসাহ শিথিল হইবার পূর্বেই নূতন উদ্যমে নূতন ভঙ্গিতে উপদেশ প্রদান করিয়া ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে উৎসাহ যোগাইতেন। শায়েখ ফরিদ ছিলেন শীর্ষস্থানীয় দরবারী। তাই তাঁহার মনোবল দৃঢ় করিবার জন্য তিনি তাঁহার নিকট ঘন ঘন পত্র প্রেরণ করিতে শুরু করিলেন।

তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া অন্য এক মকতুবে তিনি লিখিলেন, 'আমি আল্লাহ্পাকের নিকট দোয়া করি, তিনি যেন আপনার ন্যায় বুজর্গের দ্বারা শরীয়তের হুকুমসমূহ প্রচার করান। মূল কার্য ইহাই। ইহা ভিন্ন সবই নিরর্থক।

রসূলুল্লাহ্ স. এর কিশতির সাহায্যেই গোমরাহীর সলিলে নিমজ্জমান মুসলমানগণ উদ্ধার পাইতে পারে। হজরত রসুলেপাক স. বলিয়াছেন, 'আমার আহলে বায়েত নূহ আ. এর কিশতি স্বরূপ। যে ব্যক্তি ইহাতে আরোহণ করিল সে নাজাত পাইল এবং যে দূরে থাকিল সে বরবাদ হইল।'

এই মহান সৌভাগ্য অর্জনের প্রতি অন্তরে দৃঢ় মনোভাব পোষণ করিবেন। আল্লাহ্পাক আপনাকে সম্মান, বুজর্গী, শান-শওকত সবকিছুই দান করিয়াছেন। ইহার সহিত যদি ধর্ম প্রচারকার্য যুক্ত হয় তাহা হইলে আপনি হইবেন সর্বাপেক্ষা বেশী সৌভাগ্যশালী।

এই ফকিরের আপনার খেদমতের প্রতি মনোযোগী হইবার মূল কারণই হইতেছে একমাত্র সত্য ধর্ম প্রচারের প্রবল বাসনা।'

খানে আজম জাহাঙ্গীরের পিতার আমল হইতে শাহী দরবারের বিশিষ্ট ওমরাহ্ হিসাবে গণ্য হইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার নিকটও হজরত মোজাদ্দেদ র. পত্র লিখিলেন।

তিনি লিখিলেন, 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি'। তলোয়ারের নিম্নেই শরীয়ত। শরীয়ত প্রতিষ্ঠার কার্য বাদশাহ্র উপরই নির্ভরশীল। কিন্তু এই বিধান যে বিপরীত মোড় হইল। কার্য বিপর্যস্ত হইল। হায় কি আফসোস! আহা কি শরমের কথা। হায় কি সর্বনাশা ব্যাপার! এই সঙ্গীন পরিস্থিতিতে আপনার প্রতিই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। সমরাঙ্গনে পরাজিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আপনাকেই প্রকৃত বীর দৃষ্টিগোচর হইতেছে। হজরত নবীয়ে করিম স. এবং তাঁহার আল আওলাদগণের অসিলায় আল্লাহ্পাক আপনাকে তৌফিক প্রদান করুন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, লোকের দৃষ্টিতে উম্মাদ প্রতিপন্ন না হওয়া পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত মোমেন হইতে পারিবে না। আপনার মধ্যে ইসলামের জন্য প্রতিযোগিতার প্রাবল্য বিদ্যমান এবং উক্ত রূপ উম্মাদনাও আপনার মধ্যে আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই জন্য আল্লাহ্পাকের দরবারে শোকর গোজারী করিতেছে। এখন ঐ সময়– যখন সামান্য আমলের মূল্য অত্যধিক। শুধু মাত্র হিজরতই ছিল আসহাবে কাহাফগণের মূল্যবান প্রকাশ্য আমল। যুদ্ধের সময় শত্রুর সম্মুখে সামান্য বীরত্ব প্রদর্শন শান্তির সময় অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ বেশী মূল্যবান। বর্তমানে আপনি বাক্য দ্বারা যেরূপ জেহাদে লিপ্ত আছেন-তাহাই 'জোহাদে আকবর'নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। ইহাকেই যথেষ্ট হিসাবে গ্রহণ করিবেন এবং বাক্যযুদ্ধই তলোয়ারের যুদ্ধ হইতে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিবেন। আমাদের ন্যায় দুর্বল ফকিরগণ এইরূপ সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত।....'

মুফতি ছদরে জাহান ছিলেন সৈয়দ বংশীয়। বাদশাহ্ আকবরের সময় হইতে তিনি প্রধান মুফতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরও তাঁহাকে পূর্বপদে বহাল রাখেন। তিনি এবং প্রধান বিচারপতি শাহী সেজদা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন।

হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁহার নিকট লিখিলেন, '.....এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, 'মানবজাতি নিজ নিজ বাদশাহ্র ধর্মের অনুসারী।' পূর্ববর্তী যুগের কার্যসমূহ ও ঘটনা প্রবাহ এই কথারই সাক্ষ্য বহন করে। বর্তমানে যখন দেশের মধ্যে ইনকেলাব ঘটিয়াছে এবং বিধর্মীদের শত্রুতা করার শক্তি নিস্তেজ হইয়া যাইতেছে, তখন বাদশাহ্র দরবারের সভ্য ও আলেমগণের মূল কর্তব্য হইল নিজেদের সার্বিক শক্তি ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত করা। সর্বপ্রথমে ইসলামের ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তম্ভগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। বিলম্বে অনিষ্টের সম্ভাবনা। গরীব মুসাফিরগণের হৃদয় এইরূপ বিলম্বের দরুন বড়ই পেরেশান আছে। পূর্বের দূরবস্থা

সমূহের স্মৃতি এখনও মুসলমানগণের অন্তরে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। আল্লাহ্ না করুন উহার ক্ষতিপূরণ না হইলে ইসলাম দুর্বল ও দূরদেশী মুসাফিরের বেশ ধারণ করিবে। যদি বাদশাহ্গণ সুন্নত প্রচলনের বিষয়ে উৎসাহ বোধ না করেন এবং তাঁহার সঙ্গীগণও যদি নিষ্ক্রিয় থাকেন এবং ইহকালের নশ্বর জীবনের মোহ ত্যাগ করিতে রাজী না হন তবে গরীব ফকির মুসলমানগণ শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হইবেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আঁচে আযমান গম শুদা গর আজ সুলাইমাঁ গম শুদে,
হাম সুলাইমাঁ হাম পরি হাম আহরেমান বিগিরিস্তে।
সোলেমান যদি হারাতো তায় হারিয়েছি আমি যে রতন–
সোলেমান নিজে, আহরেমান পরী করিতেন ক্রন্দন।

আমির লালাবেগ ছিলেন জাহাঙ্গীরের দরবারী। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁহার নিকট লিখিলেন, 'প্রায় এক শতাব্দী অতীত হইল– ইসলাম পথিকের বেশে দিন গুজরান করিতেছে। কাফেরগণ দারুল ইসলামে প্রকাশ্যভাবে কুফরী আহকাম জারি করিয়াও তৃপ্ত হইতেছে না– তাহাদের বাসনা ইসলামী আহকাম নিশ্চিহ্ন হইয়া যাক। মুসলমান ও মুসলমানীর নাম নিশানা যেন বাকী না থাকে। তাহারা এত বেশী বাড়িয়া গিয়াছে যে, মুসলমানগণ ইসলামের কোন শেয়ার প্রচার করিতে গেলে তাহাদেরকে হত্যা করা হয়। গরু কোরবানী করা ইসলামের একটি বিশেষ কার্য। কাফেররা জিজিয়া কর দিতে রাজী হইলেও গো-হত্যা করিতে দিতে রাজী হইবে না বলিয়া মনে হয়। বর্তমানে বাদশাহ্র রাজত্বের শুরুতেই যদি ইসলামী হুকুমগুলি জারি করা হয় এবং মুসলামনদিগকে সম্মানিত করা হয়– তবেই কার্য সিদ্ধি হইবে– নতুবা মুসলমানগণ সংকটজনক অবস্থায় পতিত হইবে। ইয়া আল্লাহ্ রক্ষা কর! রক্ষা কর। আল্লাহ্পাকই জানেন কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এই সৌভাগ্যের আকাংখা করে এবং কোন বীরপুরুষ উক্ত দৌলত হাসিল করিতে সক্ষম হয়।'

কলিজ খানের নিকট লিখিলেন, 'দ্বিতীয়তঃ আপনার মাধ্যমে এই দুঃসময়েও শ্রেষ্ঠ নগরী লাহোরে যে শরীয়তের অনেক হুকুম প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার জন্য আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে শরীয়তের সাহয়তা ও দ্বীনের শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। হিন্দুস্থানের সমস্ত শহরের মধ্যে এই শহরটিকে 'কুতুবে এরশাদ' বা নির্দেশ প্রদান কেন্দ্র বলা যায়। উক্ত শহরের খায়ের বরকত ভারতের অন্যান্য শহরকে প্রভাবান্বিত করে। লাহোরে যদি ইসলামের প্রচলন হয় তবে সর্বত্রই এই রকম প্রচলিত হইবে। আল্লাহ্পাক আপনাকে মদদ প্রদান করুন। হজরত রসূলুল্লাহ্ স. বলিয়াছেন, 'আমার উম্মতগণের মধ্যে একদল সর্বদাই সত্য পথে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জয়ী হইবে। বিপক্ষ দল তাঁহাদের ক্ষতির চেষ্টা

করিয়াও সফলকাম হইবে না। এইভাবে কেয়ামত পর্যন্ত তাঁহাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিবে।' আপনি আমার পীর কেবলা র. এর সহিত দৃঢ় মহব্বত পোষণ করিতেন বলিয়া উক্ত মহব্বতের স্মরণে কিছু লিপিবদ্ধ করিলাম।'

এইভাবে হজরত মোজাদ্দেদ র. হুকুমতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণের সহিত যোগাযোগ করিয়া তাহাদেরকে ইসলাম প্রচারে উদ্বুদ্ধ করেন। সুন্নত ওয়াল জামাতই একমাত্র উদ্ধার প্রাপ্ত দল এবং তাঁহাদের অনুসরণের জন্য দেশের বাদশাহ্ ও জনসাধারণকে উৎসাহিত করা এবং সমাজের সর্বক্ষেত্রে এই আকিদা প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমেই যে প্রকৃত ইসলামের খেদমত করা হয়, বিভিন্ন মকতুবে তিনি সবাইকে এই কথা উত্তমরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন।

ক্রমে ক্রমে আবদুর রহিম খান খানান, খান জাহান, ছদরে জাহান, খানে আজম, খাজা জাহান, মীর্জা দারাব, কলিজ খান, নবাব শায়েখ ফরিদ, হাকিম ফাতহুল্লাহ, শায়েখ আবদুল ওয়াহ্হাব, সেকান্দার খান লোদী, খেজের খান লোদী, জব্বারী খান, মীর্জা বদিউজ্জামান, সৈয়দ মাহমুদ, সৈয়দ আহমদ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর দলভুক্ত হইলেন। তিনি তাঁহাদের নিকট নকশবন্দিয়া তরিকার শ্রেষ্ঠত্ব, বেলায়েত, নবুয়ত, সুন্নতের অনুসরণ, কলবের সুস্থতা, নফসে আম্মারার স্বভাব ও তার অনিষ্ট হইতে মুক্ত হইবার উপায় ইত্যাকার বিভিন্ন বিষয়ে অবগত করাইয়া তাহাদিগকে এসলাহ্ করিলেন। ফলে হুকুমতের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইতে বেদাত ও বেদাতসুলভ মনোভাব দূরীভূত হইল। মনে প্রাণে এই দল হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর নির্দেশে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরকে ইসলামের প্রতি উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর আমির ওমরাহগণের মুখে সত্য পথের সন্ধান পাইয়া শরীয়ত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন।

হজরত মোজাদ্দেদ র. সেনাবাহিনীর মধ্যেও ইসলাম প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন। সেনাবাহিনী হুকুমতের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই অংশের এসলাহ্ হওয়াও জরুরী। তিনি শায়েখ বদিউদ্দিন র.কে সেনাবাহিনীর মধ্যে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা বিশ্বাস, নকশবন্দিয়া তরিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি বিষয় প্রচারের জন্য নিযুক্ত করিলেন। উদ্দেশ্য সফল হইল। ক্রমে ক্রমে সেনাবাহিনীর এক বিপুল অংশ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর ভক্ত হইয়া উঠিল এবং অনেকেই তাঁহার মুরিদ হইলেন।

মোজাদ্দেদিয়া কাফেলা দিন দিন বাড়িয়া চলিল। মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. বিভিন্ন শহর ও গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অঞ্চলে খলিফা নিযুক্ত করিলেন। তিনি তাঁহাদের প্রতি নিয়মিত সারগর্ভ নসিহত ও জেহাদের কর্মসূচী পেশ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার প্রতিটি মকতুবের অনুলিপি প্রায় একই সঙ্গে বিভিন্ন খলিফার নিকটে প্রেরিত হইতে লাগিল। এইসব মকতুব ছিল এক একটি সংগ্রামী ইশতেহার।

জেহাদ দ্বিমুখী। প্রথমতঃ নিজের নফসের এসলাহ। অপরটি হইতেছে হুকুমতের প্রতিটি ক্ষেত্রে, সমাজের রন্ধ্রে দীর্ঘকাল ধরিয়া পুঞ্জিভূত বেদাত ও কুসংস্কারের বিলুপ্তি সাধন। সমাজ জীবনে এই ফেতনার মূল উৎস হইতেছে দুনিয়াদার আলেম ও ভন্ড সুফীগণের মনগড়া বাক্যসমূহ।

হজরত মোজাদ্দেদ র. দুনিয়াদার আলেমদের স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া দিলেন এবং তাহাদের ফেতনা হইতে মুসলমানদেরকে মুক্ত করিবার ব্যাপারে চেষ্টা করিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি লিখিলেনঃ

'.....হাদিস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তিই কেয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে, যে আলেম নিজের এলেম দ্বারা উপকৃত হয় নাই।' কেনই বা কঠিন শাস্তি পাইবে না। যে এলেম আল্লাহ্‌পাকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন উহাকে তাহারা সম্পদ, খ্যাতি ও কর্তৃত্ব হাসিল করিবার হাতিয়ার বানাইয়া লয়। অথচ দুনিয়া আল্লাহপাকের নিকট অতিশয় তুচ্ছ, হেয় ও মূল্যহীন সুতরাং আল্লাহ্‌পাকের পছন্দনীয় বস্তুর অপমান করা এবং তুচ্ছ বস্তুকে মূল্যবান মনে করা অতি কুতসিৎ কার্য। ইহা যে প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌পাকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এলেমের শিক্ষা প্রদান ও ফতোয়া জারি করা বিশুদ্ধ নিয়তে আল্লাহর ওয়াস্তে হইলে উত্তম এবং উহা হইতে হইবে সম্মান, কর্তৃত্ব, ধনলিপ্সা এবং অহংকার হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। দুনিয়াতে লিপ্ত হইয়া পার্থিব বস্তু সমূহের প্রতি আসক্তি না থাকিলেই উহা সম্ভব হইবে।

যে আলেমগণ দুনিয়ার প্রতি আসক্ত, তাহারাই দুনিয়াদার আলেম। উহারা নিকৃষ্ট আলেম, মানব সমাজের হীন জীব এবং ধর্মের চোর। অথচ উহারা নিজেদেরকে উত্তম ও সৃষ্টির সেরা ভাবিয়া থাকে। আল্লাহ্‌পাক কোরআন মজিদে বলেন, 'উহারা মনে করে যে, উহারা উত্তম বস্তু অর্জনকারী। সাবধান হও, উহারা মিথ্যাচারী। শয়তান তাহাদিগকে প্রভাবন্বিত করিয়া আল্লাহর স্মরণ হইতে বিস্মৃত করিয়া রাখিয়াছে। উহারাই শয়তানের দল। হুঁশিয়ার! নিশ্চয় শয়তানের দলই বরবাদ হইবে।'

কোন এক বুজর্গ ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিলেন যে, শয়তান নিশ্চিন্ত ও নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া আছে। কারণ জানিতে চাহিলে সে উত্তর দিল যে, বর্তমান জামানার আলেমগণ তাহার কার্যে নিয়োজিত হইয়া তাহাকে বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ করিয়া দিয়াছে।

সত্যিই, সাম্প্রতিককালে শরীয়ত ও ধর্মের কার্যাদিতে যেরূপ ঔদাসীন্য ও উপেক্ষা পরিলক্ষিত হইতেছে এবং শরীয়ত প্রচারের গতি ব্যাহত হইতেছে তাহা এই ধরণের আলেমগণের কার্যকলাপ এবং বিশুদ্ধ নিয়তের অভাবেই ঘটিতেছে।'

দুনিয়াদার আলেমগণ বেদাতে হাসানার বাহানায় তাহাদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার যে উৎস সৃষ্টি করিয়াছিল, হজরত মোজাদ্দেদ র. উহার উৎস মুখও রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন ঃ

'....আল্লাহ্পাকের দরবারে প্রকাশ্যে ও গোপনে বড়ই বিনয় এবং ক্রন্দনের সহিত আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি এই জন্য যে, দ্বীনের মধ্যে যাহা কিছু অতিরিক্ত যুক্ত হইয়াছে যাহা রসূলুল্লাহ্ স. এর জামানায় ছিল না, যদিও ইহা প্রভাতের ন্যায় উজ্জ্বল হয় তথাপি তাহা হইতে যেন রসুলেপাক স. এর অসিলায় আল্লাহ্ আমাকে ও আমার সঙ্গীগণকে উক্ত কার্যাবলীর আকর্ষণ হইতে মুক্ত রাখেন এবং উক্ত বেদাতের কোন সৌন্দর্য থাকিলে তাহা যেন অবলোকন না করান। আলেমগণ বলিয়া থাকেন যে, বেদাত দুই প্রকারঃ হাসানা (উৎকৃষ্ট) এবং সাইয়েআহ্ (নিকৃষ্ট)। যাহা নবী করিম স. এর জামানায় ছিল না অথচ যাহা সুন্নত বিনষ্ট করেনা তাহাকে হাসানা নামে অভিহিত করা হয়। আর যাহা সুন্নত উঠাইয়া দেয় তাহাকে বলা হয় সাইয়েআহ্। এই ফকির কোন বেদাতের মধ্যেই নূর খুঁজিয়া পাইতেছেনা। উহাকে শুধুই তমসাচ্ছন্ন দেখিতেছে। সংকীর্ণ দৃষ্টির কারণে বেদাতীগণের কার্যাবলী যদিও এখন মনমুগ্ধকর মনে হইতেছে, কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইলে দেখিবেন যে উহা সমূহ ক্ষতি ও লজ্জার কারণ।

প্রভাতে দেখিবে তুমি দিবসের মত-
নিশীথে কাহার প্রেমে হয়েছিলে রত।

সাইয়েদুল বাশার হজরত নবীয়ে করিম স. বলিয়াছেন, 'যাহারা আমার দ্বীনের মধ্যে এরূপ বিষয়ের আমদানী করিবে যাহা ইহার মধ্যে নাই তাহা পরিত্যাজ্য।'অতএব যাহা পরিত্যাজ্য তাহার মধ্যে সৌন্দর্য কিভাবে থাকিতে পারে।'

এইভাবে বিভিন্ন জনের নিকটে বিভিন্নভাবে তিনি দুনিয়াদার আলেমগণের উদ্দেশ্য ও ফেতনার স্বরূপ উদঘাটিত করিয়া মকতুব প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতানুযায়ী নিজেদের আকিদা বিশ্বাস দুরস্ত করাই যে মুসলমানগণের প্রধান কার্য তদ্বিষয়ে ও সবাইকে সতর্ক করিয়া দিলেন। তিনি লিখিলেন ঃ

'....আহলে সুন্নত জামাতের মতানুযায়ী স্বীয় আকিদাকে দুরস্ত করিয়া লওয়া শরীয়তের আহকামভুক্ত ব্যক্তিগণের উপর প্রথম ফরজ। কেননা এই বুজর্গগণের নির্ভুল সিদ্ধান্ত অনুসরণের উপরই পরকালের মুক্তি নির্ভরশীল। তাঁহারা ঐ দলভুক্ত

যাঁহারা রসূলুল্লাহ্ স. ও তাঁহার সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহুম আজমাইনের তরিকার উপরে প্রতিষ্ঠিত।'

ভণ্ড সুফীকুলও দ্বীনের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টির এক অন্যতম হাতিয়ার। তাহাদের বাতিল চিন্তাধারা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া মুসলমানগণের আকিদা বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছিল। তাহাদের অসৎ কার্যকলাপের প্রাবল্য শরীয়তের সৌন্দর্যকে বিকৃত ও বিবর্ণ করিয়া দিয়া মুসলমানগনের পদস্খলন ঘটাইতেছিল। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এই বিভ্রান্ত দলের ভিতেও আঘাত হানিলেন। তাহাদের বদ আকিদা খণ্ডন ও তাহা নির্ভুল করিবার জন্য তিনি তৎপর হইয়া উঠিলেন।

পূর্ববর্তী বিখ্যাত মাশায়েখদের আধ্যাত্মিক অবস্থার চাপে বিপর্যস্ত কিছু মত্ততামূলক কথার উপর ভিত্তি করিয়া এই গোমরাহ সুফী নামধারী ব্যক্তিগণ ধর্মের মধ্যে এমন সব অসৎ আকিদার আমদানী করিতে থাকে-যাহা প্রকাশ্যভাবেই সত্য সংবাদদাতা রসূলে পাক স. এর পবিত্র শরীয়তের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাহাদের অধিকাংশই পূর্ববর্তী মাশায়েখের 'হামাউস্ত' (সবই খোদা) মতবাদের মনগড়া অর্থ করিয়া বরবাদীর দরওয়াজা খুলিয়া দেয়। আর এই পথে গোমরাহীর বিষাক্ত হাওয়া আসিয়া মুসলমানগণকে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে লইয়া যায়। তাহারা মনে করিতে থাকে জমিন, আসমান, পাহাড়, পর্বত সবই আল্লাহ্ (নাউজুবিল্লাহ্)! হজরত মোজাদ্দেদ র. দৃঢ়তার সহিত এই দলকে জিন্দিক (আল্লাহকে অস্বীকারকারী) আখ্যা দিলেন। তিনি বলিলেনঃ

'মোমকেনকে হুবহু আল্লাহ্ মনে করা অর্থাৎ আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তুকে অবিকল আল্লাহ্ ভাবা এবং উক্ত বস্তুর কার্যসমূহ ও গুণসমূহকে আল্লাহ্পাকের আফআল ও সেফাত স্বরূপ জানা অতি বেয়াদবির কার্য। বরং ইহা দ্বারা আল্লাহ্পাকের আসমা (নাম) ও সেফাত (গুণাবলী) অস্বীকার করা হয়।'

'হামাউস্ত' মতবাদ পোষণকারী পূর্ববর্তী বুজর্গগনের প্রকৃত উদ্দেশ্য তিনি ব্যাখ্যা করিলেন এইভাবেঃ

'যে সমস্ত সুফিয়ানে কেরাম হামাউস্ত মতাবলম্বী তাঁহারা সৃষ্টি জগতকে আল্লাহ্পাকের সহিত একত্রিত বলিয়া মনে করেন না। এ সম্পর্কে তাঁহাদের বক্তব্য প্রতিবিম্বভিত্তিক– মূলবস্তুভিত্তিক নহে। তাঁহাদের বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ যদিও 'একত্রিত হওন' মনে হয়-কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য কখনোই উহা নয়। কারণ, এইরূপ ধারণা প্রকৃতপক্ষে কুফরী ও নাস্তিকতার সামিল। প্রকৃতপক্ষে হামাউস্তের অর্থ হইবে হামা আজ উস্ত অর্থাৎ সমস্তই আল্লাহ্তায়ালা হইতে। যদিও হালের প্রাবল্যের কারণে তাঁহারা হামাউস্ত বলিয়া থাকেন– কিন্তু আসলে এই শব্দগুলির দ্বারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য হামা আজ উস্তই হইবে।'

অতঃপর আমলের ভিত্তি যে কাশফ ও এলহাম নয়– জাহেরীভাবে কেতাব ও সুন্নত অনুযায়ী আমলই যে একমাত্র গ্রহণযোগ্য এবং কেহ যত বড় সুফীই হন না কেন, শরীয়তের অনুগত না হইলে যে তাঁহার সর্বস্ব বরবাদী সেই বিষয়ে তিনি জানাইলেন।ঃ

'শরীয়তের হুকুমগুলি প্রমাণ করিতে কেতাব, সুন্নত এবং এজমা ও কেয়াস প্রয়োজন। এই চারটি দলিল ব্যতীত অন্য কোন দলিল দ্বারা শরীয়তের হুকুম প্রমাণ করা যায় না। আউলিয়ায়ে কেরামের এলহামের সাহায্যে হালাল হারামের প্রমাণ হয় না এবং আহলে বাতেনদের কাশফ কোন বিষয়কে ফরজ সুন্নত প্রমাণ করিতে পারে না। বড় বড় মুজতাহিদগণের অনুসরণের ক্ষেত্রে খাছ খাছ বেলায়েতধারীগণও সাধারণ মোমেনদের সমপর্যায়ভুক্ত এবং হজরত জুন্নুন মিসরী র., বায়েজীদ বোস্তামী র., জোনায়েদ বাগদাদী র, হজরত শিবলী র. প্রমুখ উচ্চ পর্যায়ের অলিগণও জায়েদ, আমর, বকর ও খালেদের সমশ্রেণীভুক্ত সাধারণ মুসলমান। অবশ্য এই বুজর্গগণ অন্যান্য মর্তবার ক্ষেত্রে অত্যধিক ফজিলত রাখেন।'

গোমরাহ্ সুফীদের একটি শ্রেণী এইরূপ ধারণা করিত যে, শুধুমাত্র বাতেন দুরস্ত করিলেই চলিবে। জাহেরী আমলগুলি যেমন নামাজ, রোজা প্রভৃতি আল্লাহ্ওয়ালাদের না করিলেও চলিবে। ইহাদের সম্পর্কে হজরত মোজাদ্দেদ র. বলিলেনঃ

'যে ব্যক্তি জাহেরকে বেকার ছাড়িয়া দিয়া বাতেনকে দুরস্ত করিবার ইচ্ছা পোষণ করে, সে মুলহেদ। তাহার কোন বাতেনী হাল হইলে তাহা এসতেদ্‌রাজ বা ভেলকিবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়। জাহেরীভাবে শরীয়তের বিধানগুলি দ্বারা সুসজ্জিত হইবার মধ্যেই নির্ভর করিতেছে বাতেনী হালের বিশুদ্ধতা ও কবুলিয়ত।'

সেমা ও গান বাজনা নৃত্য ছিল গোমরাহ সুফীগণের প্রতিটি উপদলেরই সাধারণ ব্যধি। গান বাদ্যের সাহায্যে যে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া অন্য কিছুই পাওয়া যায় না হজরত মোজাদ্দেদ র. তাহাও জানাইয়া দিলেন। তিনি লিখিলেন ঃ

'নামাজের হকিকত সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই ইহাদের এক বৃহৎ শ্রেণী অন্তরের ব্যাকুলতা গান-বাদ্য, লম্ফঝম্ফ ইত্যাদি দ্বারা নিবারণের প্রয়াস পাইয়াছে। তাই নৃত্য ও বাদ্য তাহাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ ইহারা ইহাও জানে যে, 'আল্লাহ্পাক হারাম বস্তুর মধ্যে শেফা রাখেন নাই' (হাদিস)। নিমজ্জমান ব্যক্তি তৃণখণ্ড যাহাকিছু পায়– তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করে এবং কোন জিনিসের প্রতি আকর্ষণ মানুষকে অন্ধ ও বধির করিয়া দেয়। নামাজের কামালতসমূহের বিন্দু পরিমাণও যদি তাহারা অবগত হইতে পারিত তাহা হইলে বাদ্য, সংগীত ইত্যাদির প্রতি তাহারা কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করিত না। প্রকৃত রহস্য তাহারা তলাইয়া

দেখিল না। হে প্রিয় ভাই, নামাজ এবং গান বাদ্যের মধ্যে যেরূপ পার্থক্য– নামাজ হইতে যে কামালাত বা পূর্ণতা সমূহের সৃষ্টি হয় এবং গান বাদ্যের মধ্যে যে হালের উৎপত্তি হয়– উভয়ের পার্থক্যও তদ্রূপ ধারণা করিবেন। জ্ঞানীগণের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।'

মোট কথা এই ধরনের গোমরাহ্ সুফীর দল মনে করিত শরীয়ত ও তরিকত পৃথক জিনিস। তাহাদের ভুল ধারণার ফলেই তাহারা প্রকৃত ইসলাম হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু হজরত মোজাদ্দেদ র. প্রকৃত সত্যের বিশ্লেষণ স্বরূপ বলিলেনঃ

'আসল কথা এই যে, শরীয়ত এবং হকিকত অবিকল একবস্তু। প্রকৃতপক্ষে উহারা পৃথক নহে। কেবলমাত্র বিস্তৃতি ও সংক্ষিপ্তি, দলিল দ্বারা প্রমাণিত ও আত্মিক বিকাশ দ্বারা উপলব্ধিকৃত, অদৃশ্য বিশ্বাস ও চাক্ষুষ বিশ্বাস– সাধনালব্ধ ও সহজলব্ধ ইত্যাদির পার্থক্য বিদ্যমান। যে সমস্ত হুকুম ও জ্ঞান শরীয়তের সাহায্যে পূর্বে জানিতে পারা যায় তাহাই হক্কুল একিনের স্তরে আত্মিক প্রশস্ততা কর্তৃক বিস্তৃতভাবে উপলব্ধিতে আসে।'

অতঃপর তিনি শরীয়তের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে বর্ণনা করিলেন এইভাবেঃ

শরীয়ত তিন ভাবে বিভক্ত– এলেম (জানা), আমল (এলেম অনুযায়ী কার্য করা) এবং এখলাছ (সর্ববিধ কার্যের মূল– বিশুদ্ধ নিয়ত অর্জন করা)। শরীয়তের এই তিনটি অংশ যদি পূর্ণরূপে সম্পন্ন না হয় তবে তাহাকে শরীয়তই বলা যাইবে না। উক্ত শরীয়ত যখন পূর্ণ হইবে তখন আল্লাহ্পাকের সন্তুষ্টিও হাসিল হইবে যাহা দুনিয়া আখেরাতের সমস্ত প্রকার নেয়ামত হইতে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্পাক ফরমাইয়াছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টিই উৎকৃষ্টতম। 'অতএব দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় সৌভাগ্য শরীয়তের মধ্যেই নিহিত। এমন কোন সৌভাগ্য নাই যাহার জন্য শরীয়ত ব্যতীত অন্য কোন কিছুর দ্বারস্থ হইতে হয়।

তরিকত ও হকিকত যাহার উপরে সুফীগণের একচেটিয়া আধিপত্য তাহা শরীয়তের তৃতীয় অংশ এখলাস অর্জনের সাহায্যকারী খাদেম স্বরূপ। ইহা দ্বারা শরীয়ত পূর্ণ করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

তিনি আরও জানাইলেন 'জানা প্রয়োজন যে সুরত ও হকিকতের সমষ্টির নাম শরীয়ত। জাহেরী শরীয়ত, সুরত বা আকৃতি নামে অভিহিত এবং বাতেনী শরীয়তকে হকিকত বা প্রকৃত তত্ত্ব বলা হয়। সুতরাং খোলস ও সারাংশ উভয়ই শরীয়তের অংশ এবং মোহকাম ও মোতাশাবেহ্ উভয়ই ইহার অংশ বিশেষ। জাহেরী আলেমগণ উহার খোলস লইয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। পক্ষান্তরে ওলামায়ে রাসেখীন উক্ত খোলস ও সারবস্তু মিলিত করিয়া আকৃতি ও সারবস্তু উভয়ের পূর্ণ কামালাত হাসিল করিয়াছেন।'

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সংস্কার কার্য পূর্ণ উদ্যমে চলিতে লাগিল। দ্বীনের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টির যতরকম উৎস ছিল, প্রতিটির মুখেই তিনি শক্ত বাঁধ দিতে লাগিলেন। ছোট বড়, সূক্ষ্ম স্থূল সর্বপ্রকার বেদাত তিনি তাঁহার মোজাদ্দেদসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচক্ষণতার সাহায্যে উদ্ধার করিলেন এবং নিপুন চিকিৎসকের মতো সেই সব ব্যাধির প্রতিষেধক প্রয়োগ করিলেন। বিভিন্ন কৌশলে হেকমতের আলোকে তিনি সর্বপ্রকার বেদাত ও তাহাদের অনিষ্টসমূহ এমনভাবে প্রকাশিত করিতে লাগিলেন যাহাতে সত্য মিথ্যার প্রভেদ না বুঝিবার কোন কারণ অবশিষ্ট রহিল না।

শুধু হিন্দুস্তানেই নয়– হিন্দুস্তানের বাহিরে মা অরা উন্নাহার, বদখশান, খোরাসান, তুরান প্রভৃতি স্থানেও তিনি খলিফা নিযুক্ত করিলেন। সমস্ত খলিফাগণই ছিলেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শী এবং বিচক্ষণ। তাঁহারা দ্বিতীয় হাজার বৎসরের মোজাদ্দেদের সংসর্গের ফজিলতে এক একটি রত্নে পরিণত হইয়াছিলেন এবং ইসলাম প্রচারের জন্যে নিজের জীবনকে কোরবান করিয়াছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মকতুবসমূহ বিভিন্ন খলিফাগণের নিকট পৌঁছিতে লাগিল এবং তাঁহারা দ্বীন ইসলামের ভিতরে দীর্ঘদিন ধরিয়া পুঞ্জিভূত কুফরী আকিদা সমূহ ধ্বংস করিয়া তদস্থলে সত্য ইসলামের নূর প্রজ্জ্বলিত করিতে লাগিলেন।

দার্শনিকদের ভ্রান্ত মতবাদজনিত ফেতনা, জাহেল শ্রেণীর মুসলমানগণের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর কুফরী রছুমাত– কোনকিছুই হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না।

কিছু মুসলিম দার্শনিকের মত ছিল, বিশ্ব চিরন্তন। আসমান জমিন কোনকিছুই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে না। মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. গ্রীক দার্শনিকদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত এইসব ভিত্তিহীন দর্শনের বিরুদ্ধে লিখিলেন ঃ

'আসমান ও জমিন বিনাশপ্রাপ্ত হইবে না বলিয়া দার্শনিকগণ যে মত পোষণ করেন, অজ্ঞতার দরুন শেষ জামানার কিছু সংখ্যক মুসলমান দার্শনিকও তাহাদের অনুকূল মত প্রকাশ করেন এবং কিছু সংখ্যক মুসলমান ইহা সমর্থনও করেন। তাহারা কোরআন মজিদের অখণ্ডনীয় দলিলে অবিশ্বাসী এবং নবী আ.গণের

এজমাকেও তাহারা স্বীকার করেন না। কোরআন শরীফের বহু আয়াত এই মতবাদের বিরুদ্ধে। তাহারা জানেন না যে, কেবল কলেমা শাহাদত মুখে উচ্চারণ করিলেই চলিবে না। এই সকল বিষয়ের উপর বিশ্বাসও রাখিতে হইবে, নতুবা ঈমান থাকিবে না।'

শিয়া মতবাদ ছিল আর একটি বিষাক্ত ছোবল। ইহাদের ছোবলের বিষে সুন্নি মুসলমানদের একটি বিরাট দল সুন্নত ওয়াল জামাত এর আকিদা বিশ্বাস হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল। তাহা ছাড়া সম্রাজ্ঞী নুরজাহান নিজে ছিলেন শিয়া। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের উপর তাঁহার প্রভাব ছিল অত্যধিক। হুকুমতের কেন্দ্রবিন্দুতে উপবিষ্ট এই বিচক্ষণা মহিলা শিয়াদের সর্বপ্রকার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছিলেন। ফলে তাহারা অবাধে তাহাদের আকিদাগত ব্যাধি ছড়াইবার সুযোগ পাইয়াছিল। মাশহাদের কোন কোন শিয়া আলেম মা অরা উন্নাহারের সুন্নি আলেমগণের একটি পুস্তিকার জবাবে মিথ্যা ও শঠতায় পরিপূর্ণ একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এই পুস্তিকায় তিন খলিফাকে কাফের বলা হইয়াছিল এবং মা আয়েশা সিদ্দিকা রা.কে অপবাদ দেওয়া হইয়াছিল। হিন্দুস্তানের শিয়াগণ জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ করিয়া আমির ওমরাহদের মধ্যে এই পুস্তিকা ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করে। ফলে ইহার প্রভাব সাধারণ মুসলমানদের উপরও পড়িতে থাকে। হজরত মোজাদ্দেদ র. ইহার অসারতা ও ধোঁকাবাজি খাছ ও আম লোকের সম্মুখে সুন্দররূপে তুলিয়া ধরেন এবং ইহার দাঁতভাঙ্গা জবাব লিখিয়া প্রচার করেন। ইহা ছাড়া তিনি যৌবনকালে বাদশাহ্ আকবরের সময় 'রদ্দে রাফেজী' নামক একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। শিয়া মতবাদ খণ্ডনের জন্য উহাই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি শিয়া আলেমগণের সহিত প্রকাশ্যে বিতর্ক করিয়া তাহাদের বাতিল ধারণা রদ করেন।

বিভিন্ন মকতুবেও তিনি শিয়াদের কদর্য আকিদার স্বরূপ উদঘাটন করেন এবং বহু সংখ্যক মকতুবে সাহাবাগণের এমনভাবে প্রশংসা করেন, যাহার ফলে সুন্নি মুসলমানদের মধ্য হইতে শিয়াদের প্রভাব অতি দ্রুত বিলুপ্ত হইতে থাকে।

তিনি এক মকতুবে লিখিলেন ঃ

'বেদাতী ব্যক্তিদের সংস্রব কাফেরদের সংসর্গ হইতেও মন্দ। তাহাদের মধ্যে যাহারা হজরত নবীয়ে করিম স. ও তাঁহার সাহাবী রা.গণের প্রতি হিংসা রাখে তাহারা সর্বাধিক নিকৃষ্ট। আল্লাহ্পাক কালামপাকে তাহাদিগকে কাফের বলিয়াছেন, 'লি ইয়াগিজা বিহিমুল কুফফার।' অর্থাৎ আল্লাহ্পাক সাহাবাগণকে দিয়া কাফেরদেরকে ক্ষুব্ধ করেন। সাহাবী রা. গণ কোরআন শরীফ এবং শরীয়তের হুকুমসমূহ প্রচার করিয়াছেন। যদি তাঁহারা দোষী হন তাহা হইলে কোরআন শরীফ ও শরীয়ত দোষমুক্ত থাকিবে না। হজরত ওসমান আলায়হি রেদওয়ান কোরআন

শরীফ একত্রিত করিয়াছেন। যদি তিনি নিন্দিত হন তবে কোরআন শরীফও নিন্দিত হইবে। আল্লাহ্পাক আমাদিগকে জিন্দিক কাফেরগণের ন্যায় কদর্য বিশ্বাস হইতে রক্ষা করুন।

'....কুতুবে জামান হজরত মখদুমে জাহানের (হজরত মীর জালালউদ্দিন বোখারী র.)– নির্ভরযোগ্য কেতাবাদি কিছু কিছু আপনার দরবারে প্রতিদিন আলোচনা করা প্রয়োজন। তিনি সাহাবা রা.গণের যে কত প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন এবং কত তাজিমের সহিত তাহাদের নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বলিবার নয়। ইহা দেখিয়া যেন বিরুদ্ধবাদীরা লজ্জিত ও অপমানিত হয়। সম্প্রতি ইহারা অতিরিক্ত বাড়িয়া গিয়াছে এবং চতুর্দিকে ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য চালাইতেছে। এই কারণে আপনার নিকট কিছু লিপিবদ্ধ করিলাম, যাহাতে আপনার খেদমতে উহাদের স্থান না মিলে।'

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মোজাদ্দেদসুলভ এলেম ও দৃঢ়তার সম্মুখে শিয়া মতবাদের প্রখরতা স্তিমিত হইয়া আসিল। বীরত্বের সহিত তিনি শিয়া মতবাদের বিষাক্ত ছোবল প্রতিহত করিলেন। ইহা ছাড়া নকশ্বন্দিয়া তরিকার ব্যাপক প্রচারের দিকেও তিনি সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখিতেছিলেন। কারণ এই বুজর্গগণের তরিকা অবিকল সাহাবা রা.গণের তরিকা। সামান্যতম বেদাতকেও এই তরিকায় স্থান দেওয়া হয় না। তিনি বহুসংখ্যক মকতুবে নক্শবন্দিয়া তরিকার বিশেষত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, উচ্চতা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন এবং এই তরিকার বুজর্গগণের বিভিন্নমুখী প্রশংসা করিলেন। ফলে সমস্ত হিন্দুস্তানব্যাপী নক্শবন্দিয়া নূর ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিল।

ইতোমধ্যে শাহজাদা শাহজাহান আসিয়া হজরত মোজাদ্দেদ র. এর আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। তিনি ছিলেন সুন্নি। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাহাকে পছন্দ করিলেন। শাহজাদা শাহজাহান হজরত মোজাদ্দেদ র. এর খাছ ভক্তদের মধ্যে সামিল হইলেন।

কুফরী বেদাতের তমসা দ্রুত অপসারিত হইতেছে। হেদায়েতের সূর্য মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাধ্যমে হুকুমতের দিগন্তে দীর্ঘ দুঃস্বপ্নের অমানিশা দূর করিবার শপথে দীপ্তমান। তাহার প্রখর কিরণে বিভ্রান্ত মুসলমানগণ নিজেদেরকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইতে লাগিলেন। আর ভয় নাই। আর বিলম্ব নাই। এইবার আল্লাহ্পাকের দুনিয়ায় আল্লাহ্পাকের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হইবে। অবশ্যই হইবে।

সম্রাজ্ঞী নূরজাহান রোষানলে জ্বলিতে লাগিলেন। সেরহিন্দের সেই ফকির তাহার সমস্ত পরিকল্পনা লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতেছে। তাহার সমস্ত আশা আকাঙ্খা সমূলে বিনাশ করিবার অপচেষ্টায় লিপ্ত হইয়াছে। তাহার কত আশা, জামাতা শাহরিয়ারকে দিল্লীর মসনদে উপবিষ্ট করাইবেন। সমগ্র হিন্দুস্তানে শিয়া সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হইবে। শাহজাহান সুন্নি। তাহা ছাড়া সে কোনদিনই নূরজাহানের আধিপত্য মানিয়া লইবে না। কাজেই কিছুতেই তাহাকে দিল্লীর মসনদে বসিতে দেওয়া যায় না।

কিন্তু সেরহিন্দের ফকির যে তাহার সমস্ত পরিকল্পনা নস্যাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছে। রাজ্যব্যাপী শিয়া মতবাদের প্রভাব সে প্রতিহত করিতেছে। একজন সামান্য ফকিরের এত তেজ! এত শক্তি! সমস্ত সাম্রাজ্যব্যাপী এক বিরাট মজবুত সংগঠনকে সে জালের মত ছড়াইয়া রাখিয়াছে। হুকুমতের অধিকাংশ আমির ওমরাহগণকে কব্জা করিয়া ফেলিয়াছে। শাহজাহানও হইয়াছে তাহার ভক্ত। কিন্তু আর তাহাকে বাড়িতে দেওয়া হইবে না। যেভাবেই হোক তাহার সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিতে হইবে। সে আবার নক্শবন্দিয়া তরিকা নামে এক অদ্ভুত তরিকার আমদানী করিয়াছে। গান, বাজনা, কাওয়ালী সমস্ত কিছুই নাকি সেই তরিকায় নিষিদ্ধ। না। আর নয়। আর তাঁহাকে বাড়িতে দেওয়া যাইবে না। ফকির হইয়া সে হুকুমতের ব্যাপারে নাক গলাইয়াছে। নিশ্চয়ই তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল নয়। 'মালেকা এ হিন্দুস্তাঁ– এর সহিত সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছে। এই গর্হিত কার্যের জন্য তাহাকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে হইবে।

সম্রাজ্ঞী নূরজাহান আক্রোশে ফাটিয়া পড়িলেন। তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত শিয়াদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ মহাদুশ্চিন্তায় পড়িলেন। তাহাদের প্রভাব যে বিলুপ্তপ্রায়। এ সবের জন্য একমাত্র দায়ী সেরহিন্দের সেই ফকির শায়েখ আহমদ। তাহারা সবাই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। সবাই পরামর্শক্রমে ঠিক করিলেন নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খানের দ্বারা বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, সেরহিন্দের ফকির মোঘল হুকুমতের জন্য এক হুমকিস্বরূপ। সে বড়ই অহংকারী। শাহী আদবের সে বিন্দু পরিমাণ তাজিমও করে না।

একদিন তাহারা সুযোগ বুঝিয়া হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. এর নিকট লিখিত হজরত মোজাদ্দেদ র. এর একখানি মকতুব বাদশাহ্র হাতে দিয়া বলিলেন, 'শায়েখ আহমদ নিজেকে সিদ্দিকে আকবর রা. হইতেও শ্রেষ্ঠ মনে করেন– এই মকতুবই তার প্রমাণ।'

বাদশাহ্কে মকতুবখানি পড়িয়া শোনান হইল। সুলুকের সময়ের বিভিন্ন মাকাম অতিক্রমণের বিষয় ইহাতে লিপিবদ্ধ ছিল। হজরত মোজাদ্দেদ রা. লিখিয়াছিলেনঃ

'....উক্ত মাকাম দ্বিতীয়বার পরিভ্রমনের সময় উপর্যুপরি অনেক মাকাম নজরে আসিতেছিল। দীনতা ও হীনতা সহকারে বিনীতভাবে লক্ষ্য করার পর যখন উক্ত মাকামের ঊর্ধ্বের মাকামে উপস্থিত হইলাম তখন বুঝিতে পারিলাম, ইহা হজরত ওসমান জিন্নুরাইন রা. এর মাকাম এবং অন্যান্য খলিফাগণও ইহা অতিক্রম করিয়াছেন, ইহা অন্যকে পূর্ণতা প্রদান ও পথ প্রদর্শনের মাকাম।'

পূর্ববর্ণিত দুই মাকামও অনুরূপ ছিল। অতঃপর ইহার ঊর্ধ্বে আরও এক মাকাম দৃষ্ট হইল। সেখানে পৌঁছিবার পর বুঝিলাম যে, ইহা হজরত ওমর ফারূক রা. এর মাকাম– অন্যান্য খলিফাগণও ইহা অতিক্রম করিয়াছেন। ইহার ঊর্ধ্বে হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. এর মাকাম প্রকাশিত হইল। সেখানেও উপস্থিত হইলাম।

সিলসিলার পীরগণের মধ্যে হজরত নক্শবন্দ কুদ্দিসা সিররূহ্ সবসময় আমার সঙ্গী ছিলেন। অন্যান্য খলিফাগণকেও হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. এর মাকাম অতিক্রম করিতে দেখিলাম। তাঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য বুঝিতে পারিলাম না। কেবলমাত্র দেখিলাম যে, কেহ ক্ষণকাল অবস্থান করিতেছেন, কেহবা চলন্ত অবস্থায় এবং কেহ স্থায়ী। তাহার ঊর্ধ্বে হজরত রসুলেপাক স. এর মাকাম ব্যতীত অন্য কাহারো মাকাম আছে বলিয়া প্রতীয়মান হইল না।

হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. এর মাকামের সম্মুখে কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে, যেমন সমতল ভূমি হইতে বারান্দা কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে থাকে– তথায় সুন্দর মনোহর, নূরানী একটি মাকাম প্রকাশ পাইল। জানিতে পারিলাম, ইহা মাহবুবীয়াতের মাকাম। উক্ত মাকাম রঙ্গীন ও কারুকার্য খচিত ছিল। উক্ত মাকামের রংগে আমিও রঞ্জিত হইলাম। তৎপর দেখিলাম যে আমি বায়ু অথবা মেঘখণ্ডের অনুরূপ সূক্ষ্ম বস্তুর মত হইয়া আসমানের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলাম। হজরত খাজা নকশবন্দ কুদ্দিসা সিররূহ্ হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. এর মাকামে রহিলেন এবং আমি একই মাকামের বরাবরে উল্লেখিত রূপে নিজেকে দেখিতে পাইলাম।'

বাদশাহ্ সব শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এতদিন তিনি হজরত শায়েখ আহম্মদ র.কে কতইনা উত্তম জানিতেন। হুকুমতের আমির ওমরাহগনের নিকট তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া তাঁহাকে কতইনা শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু তিনি এইরূপ বদ ধারণা অন্তরে পোষণ করেন তাহা ভাবিতেও অবাক লাগে। বাদশাহ্ বড়ই দুঃখিত

হইলেন। বাদশাহ্ এইসব অসংযত ও অন্যায় উক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হজরত মোজাদ্দেদ র.কে শাহী দরবারে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

দরবারে আসিয়া হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এত পরিষ্কারভাবে বিষয়টি বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরকে বুঝাইয়া দিলেন যে, বাদশাহ্র মনে বিন্দুপরিমাণ ক্ষোভও আর অবশিষ্ট রহিল না।

হজরত মোজাদ্দেদ র. বলিলেন, 'হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. হইতে হজরত আলী রা.কে শ্রেষ্ঠ ধারণাকারী ব্যক্তি যেরূপ সুন্নত ওয়াল জামাত বহির্ভূত তদ্রূপ নিজেকে নিকৃষ্ট কুকুর হইতে উত্তম ধারণাকারী ব্যক্তিও ফকির নামের অযোগ্য। অতএব, কেমন করিয়া আমি নিজেকে সিদ্দিকে আকবর রা. হইতে উৎকৃষ্ট ভাবিতে পারি। পীরের তাওয়াজ্জোহ্ এর কারণে সালেকগণ বিভিন্ন মাকাম পরিভ্রমণ করে, উক্ত মকতুবে সেই পরিভ্রমণের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সালেকগণের এই প্রকারের পরিভ্রমণ ও উন্নতি নিতান্তই সাময়িক। শাহী দরবার আমিরগণের স্থায়ী স্থান। বাদশাহ্ যদি কোন সময় প্রয়োজন বশতঃ বা কোন কারণে কোন সিপাহীকে তলব করিয়া দরবারে আনেন তাহা অসম্ভব নয়। কিন্তু ইহা অস্থায়ী ব্যাপার। ক্ষণকাল পরেই সিপাহী নিজস্থানে প্রত্যাবর্তন করে এবং দরবারী স্থায়ীভাবে দরবারে অবস্থান করেন। সিপাহীর এই আগমন তাহাকে দরবারীগণের উপর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করিতে পারে না। ঠিক সেইরূপ উরুজ বা বিভিন্ন মাকামে উত্থান ও পরিভ্রমণ সাময়িক ভাবেই হইয়া থাকে। উক্ত মাকাম পরিভ্রমণের অবস্থাও আমার সাময়িকভাবে হইয়াছিল। এই তত্ত্বটি অবগত হইলে উক্ত মাকামে সিদ্দিকী অর্থাৎ সিদ্দিকে আকবর রা. হইতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ধারণা করা কোনক্রমেই সম্ভন নয়।

ইহা ছাড়াও উক্ত মকতুবে এ কথারও উল্লেখ ছিল যে, উক্ত মাকামের রংগে আমিও রঞ্জিত হইলাম। সূর্যের আলোক পৃথিবীতে পতিত হইলে পৃথিবী আলোকিত হয়। কিন্তু পৃথিবী কি কখনও সূর্যের চাইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে?

বিস্ময়কর বিশ্লেষণ! অকাট্য যুক্তি। বাদশাহ্ উত্তর শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তাঁহার ক্ষুব্ধ অন্তর শীতল হইল। তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. অত্যন্ত কদর করিলেন এবং তাঁহাকে সসম্মানে বিদায় দিলেন।

চক্রান্তকারীরা হতাশ হইল। তাহাদের ষড়যন্ত্রের বিফলতা দেখিয়া তাহারা দমিয়া গেল। কিন্তু হাল ছাড়িল না। নূরজাহানের ভ্রাতা উজির আসফ খান নতুন করিয়া উদ্যোগ লইলেন। যেভাবেই হোক শায়েখ আহমদকে পরাস্ত করিতে হইবে। তাহা না হইলে মোঘল হুকুমত হইতে শিয়া প্রভাব চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তিনি সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

বাদশাহ্র মেজাজ বুঝিয়া তিনি একদিন তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন, 'জাঁহাপনা! শায়েখ আহমদের উদ্দেশ্য ও প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক থাকা প্রয়োজন! তাঁহার প্রভাব

দিন দিন যেভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে রাজ্যব্যাপী কোন নুতন ফেতনার আশংকা একেবারে অমূলক নয়। শাহী দরবার হইতে শুরু করিয়া হুকুমতের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁহার লক্ষ লক্ষ মুরিদান। তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের পীরের জন্য জান কোরবান করিতে প্রস্তুত। তাহা ছাড়া শুধু হিন্দুস্তানে নয়– ইরান, তুরান, বদখশান প্রভৃতি স্থানেও তাঁহার প্রভাব অতি দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে। শাহ্ ইসমাইল ছফবী তাঁহার মুরিদগণের সাহায্যে ইরানের হুকুমত দখল করিয়াছিলেন। শায়েখ আহমদ একজন অহংকারী ব্যক্তি। তাঁহার উদ্দেশ্যের সততা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ আপনার সেনাবাহিনীরও এক বিরাট অংশকে তিনি করায়ত্ব করিয়া ফেলিয়াছেন। সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজ দলভুক্ত করিবার জন্য তিনি শায়েখ বদিউদ্দিন নামে একজন খলিফাকেও স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি সৈন্যদের সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং সকলকে শায়েখ আহমদের দলে ভিড়াইবার জন্য উৎসাহিত করেন। জাঁহাপনা! এ বিষয়ে আশু হস্তক্ষেপ করা উচিত বলিয়া বিবেচনা করি।’

বাদশাহ্ মনোযোগ দিয়া সব শুনিলেন। তাঁহার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হইল। এমতাবস্থায় কি করা যায় তিনি তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আসফ খান পরামর্শ দিলেন, জাঁহাপনা– প্রথমতঃ শায়েখ বদিউদ্দিনের নিকট সৈন্যদের গমনাগমন বন্ধ করিবার নিষেধাজ্ঞা জারী করা প্রয়োজন। তাহার পর যদি শায়েখ আহমদের নিকট হইতে কোন বাধা আসে তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কয়েদ করা উচিৎ।

বাদশাহ্ শায়েখ বদিউদ্দিনের নিকট সৈন্যদের গমনাগমনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিলেন। শায়েখ বদিউদ্দিন মহা অসুবিধায় পড়িলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর নির্দেশ মত তিনি সেনাবাহিনীর লোকদেরকে ইসলামের প্রকৃত উদ্ধারপ্রাপ্ত দল সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা বিশ্বাস ও নক্শবন্দিয়া তরিকার শ্রেষ্ঠত্বের ছায়াতলে একত্রিত করিবার দায়িত্বকে সমস্ত জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু শাহী নিষেধাজ্ঞা সৈন্যদের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ বন্ধ করিয়া দিল। তিনি পত্রে মোর্শেদ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর নিকট পরিস্থিতির জটিলতা সম্পর্কে জানাইয়া এই স্থান পরিত্যাগের অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁহাকে অনুমতি দিলেন না। বরং পূর্ণ উদ্যমে সৈন্যদের সহিত পুনরায় যোগাযোগ করিয়া সত্যের প্রচারকার্য চালাইয়া যাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিলেন। শায়েখ বদিউদ্দিন মোর্শেদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বিপত্তি দেখা দিল কিছুদিন পর। বাদশাহ্ গুপ্তচর নিয়োগ করিলেন। গুপ্তচরগণ হজরত মোজাদ্দেদ র. ও শায়েখ বদিউদ্দিনের মধ্যে পত্র যোগাযোগ বন্ধ করিয়া দিল।

শায়েখ বদিউদ্দিন অত্যন্ত পেরেশান হইয়া পড়িলেন। মোর্শেদের সঙ্গে যোগাযোগ নাই। কোন প্রকার সংবাদ আদান প্রদান করিবার উপায় নাই। কিভাবে তিনি কি করিবেন বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। অনেক চিন্তা করিয়া তিনি সেরহিন্দ শরীফে ফিরিয়া যাওয়ার ব্যাপারেই মনস্থির করিলেন।

শায়েখ সাহেব হজরত মোজাদ্দেদ র. এর খেদমতে হাজির হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া হজরত মোজাদ্দেদ র. অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে ভৎর্সনা করিলেন। শায়েখ সাহেব বুঝিতে পারিলেন, মোর্শেদের হুকুম ব্যতিরেকে তাঁহার চলিয়া আসা সমীচীন হয় নাই। তাই তিনি পুরবায় পূর্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন এবং তাঁহার প্রতি অর্পিত কার্য সম্পাদনে মনোনিবেশ করিলেন।

বিরোধী দল আর একটি মোক্ষম সুযোগ পাইল। এই ঘটনা তাঁহারা বাদশাহ্র নিকট বর্ণনার পর বলিলেন, 'শায়েখ বদিউদ্দিন যে শাহী লশকরের পয়গাম লইয়া সেরহিন্দ গমন করিয়াছিলেন, ইহাতে কোনপ্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই। জাঁহাপনা! নিশ্চয়ই গোপনে গোপনে আপনার হুকুমতে ইনকেলাব ঘটাইবার এক বিরাট ষড়যন্ত্র চলিতেছে। অবিলম্বে এই ষড়যন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করা একান্ত প্রয়োজন। নতুবা সর্বনাশ হইয়া যাইবে।

নূরজাহান ও আসফ খান এর নেতৃত্বে পরিচালিত বিরোধী দলের নিকটই বাদশাহ্ পরামর্শ চাহিলেন। তাহাদের কেহ বলিল 'শায়েখ আহমদকে কয়েদ করা প্রয়োজন।'

কেহ বলিল, 'তাঁহাকে দেশত্যাগে বাধ্য করান উচিৎ।'

কেহ পরামর্শ দিল, 'সবোত্তম পন্থা হইল তাহাকে কতল করিয়া ফেলা।

আসফ খান বলিলেন, জাঁহাপনা, শায়েখ আহমদ যে সেজদায়ে তাজিমি করেন না তাহাতো আপনি পূর্বেই দেখিয়াছেন। অথচ বাদশাহ্র সালামতের জন্য এরূপ সেজদা জায়েজ। শুধুমাত্র অহংকারের বশবর্তী হইয়া সে আপনাকে সেজদা করে না। ইহা আপনার প্রতি তাহার আন্তরিক ঘৃণার পরিচায়ক।'

বাদশাহ্ বিরোধীদের দ্বারা পরিপূর্ণরূপে প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে রাজত্ব হারাইবার আশংকাও দেখা দিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিভাবে কার্য শুরু করা যায়?

আসফ খান বলিলেন, 'প্রথমতঃ শাহী আনুগত্য স্বচক্ষে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য তাহাকে দরবারে তলব করুন। তারপর সেজদা করিতে অস্বীকার করিলে তাহাকে কতল করিবার নির্দেশ দিন।

বাদশাহ্ তবুও চিন্তা করিতে লাগিলেন রাজ্যব্যাপী তাঁহার লক্ষ লক্ষ মুরিদান। বিশেষ করিয়া হুকুমতের আমির ওমরাগণের এক বিরাট অংশ তাঁহার ভক্ত ও মুরিদ। শুধু হত্যা করিলেই তো হইবে না তাহার প্রতিক্রিয়ার কথাও চিন্তা করিতে হইবে। শেষে না এক মহাবিপ্লবের আগুনে তাঁহার নিজেকেই আত্মাহুতি দিতে হয়।

আসফ খানও এই কথা ভাবিতে লাগিলেন। শেষে পরামর্শ দিলেন, 'রাজধানীর আমির ওমরাহগণের মধ্যে যাঁহারা শায়েখ আহমদের ভক্ত, তাঁহাদেরকে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বদলি করিয়া দেওয়া হোক। তাহা হইলে যে ধরনের প্রতিক্রিয়াই আসুক না কেন তাহা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হইবে।'

বাদশাহ্ তাহাই করিলেন। খান খানানকে দাক্ষিণাত্যে, ছদরে জাহানকে পূর্বাঞ্চলে, খান জাহান লোদীকে মালয়ে, খান আজমকে গুজরাটে এবং মহব্বত খানকে কাবুলের শাসনকর্তার ভার দিয়া তাঁহাদেরকে নিজ নিজ স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

হজরত মোজাদ্দেদ র. আমন্ত্রণপত্র পাইলেন। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর তাঁহাকে দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। বাদশাহ্র আমন্ত্রণ। মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. পূর্বেই তাঁহার বাতেনী কাশফ্ দ্বারা অবগত হইয়াছিলেন, বাদশাহ্ ও তাঁহার দরবারীগণের একাংশ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাহারা তাঁহাকে কতল করিতে চায়। সামনে বিপদ এবং এই বিপদ আল্লাহ্পাকের ইচ্ছা অনুযায়ী সম্পাদিত হইবে। ইহার মধ্যে যে অনেক হেকমত, অনেক রহস্য। আপাতদৃষ্টিতে বিপদ মনে হইলেও ইহার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে প্রকৃত বিজয়। আল্লাহ্পাক সর্ববিষয়ে অধিক জ্ঞানী। তিনি মোমেনদের প্রতি বড়ই দয়াবান।

হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁহার পাঁচজন বিশিষ্ট খলিফাসহ শাহী দরবার অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। রাজধানীতে পৌঁছিয়া তিনি উজির আসফ খাঁন এর নিকট তাঁহার আগমন সংবাদ প্রেরণ করিলেন। আসফ খাঁন তাহার অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইল। সে চিন্তা করিয়া ঠিক করিল, যে সময় বাদশাহ্র মেজাজ সাধারণতঃ উগ্র থাকে, সেই সময়ই হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সহিত তাঁহার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে অতি সহজেই সামান্য কোন বিষয় লইয়া দুজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।

তাহাই হইল। বাদশাহ্ সিংহাসনে উপবিষ্ট। বিভিন্ন কারণে মেজাজ তাঁহার উগ্র। এমন সময় দরবারে প্রবেশ করিলেন হজরত মোজাদ্দেদ র.। কিন্তু দরবারে প্রবেশ করিয়া সেজদা তো দূরের কথা, বাদশাহ্কে তিনি সালামও জানাইলেন না।

বাদশাহ্ ক্ষিপ্ত হইলেন। প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি দরবারের শৃঙ্খলা রক্ষা করেন নাই।'

হজরত মোজাদ্দেদ র. বলিলেন, কিরূপে?'

'আপনি সেজদাও করেন নাই– সালামও দেন নাই।'

আপনার দরবারে সালাম দিবার প্রথা নাই। সে কারণেই সালাম প্রদান হইতে বিরত রহিয়াছি। আর সেজদা তো একমাত্র আল্লাহ্র জন্য।'

'ইহা তাজিমি সেজদা।'

হজরত মোজাদ্দেদ র. দৃঢ় তেজদীপ্ত স্বরে বলিলেন, 'আমার মাথা মানুষের সামনে নত হয় না।'

বাদশাহ্ অপ্রতিভ হইলেন। কি আশ্চর্য সাহস এই ফকিরের। হইবে না কেন? আমিরুল মোমেনীন হজরত ওমর ফারূকের রা. রক্ত যে তাঁহার প্রতিটি শিরায় শিরায় প্রবহমান। বাদশাহ্ ক্ষণকাল অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন হজরত মোজাদ্দেদ রা. এর প্রতি। ঈমানের তেজ আর ফকিরির সৌন্দর্য দেখিয়া তাঁহার অন্তর মুগ্ধ হইয়া গেল।

তিনি ক্ষিপ্ততা পরিহার করিয়া সাধারণভাবে বলিলেন, 'বেশ। আপনার জন্য পূর্ণাঙ্গ সেজদার হুকুম উঠাইয়া লওয়া হইল। আপনি শির সামান্য নত করিলেই আমি সন্তুষ্ট হইব।

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সমস্ত অবয়বে ফারূকী দৃঢ়তা। পূর্বের ন্যায় এবারও তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'অসম্ভব।'

বাদশাহ্র শাহী মর্যাদায় প্রবল আঘাত লাগিল। এই বিশাল হিন্দুস্তানের একচ্ছত্র অধিপতি তিনি। তাঁহার সামান্য অঙ্গুলী হেলনে এই রাজ্যে দিন রাত্রিতে পরিণত হয়। রাত্রি হয় দিন। আর আদেশ নয়, ইহাকে তো সামান্য আবদারও বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহারও কোন মূল্য রহিল না। মোঘল দাম্ভিকতা বাদশাহ্কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

তিনি প্রবল রোষভরে হুকুম দিলেন, 'ইহাকে মস্তক জোর করিয়া নত করাইয়া দাও।'

অনেক লোক বাদশাহ্র হুকুম প্রতিপালনে আগাইয়া আসিল। তাহারা অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মস্তক এতটুকুও অবনত করাইতে পারিল না। এই দৃশ্য দেখিয়া বাদশাহ্র ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। দরবারীগণ পরামর্শ দিলেন, 'কতল করিবার হুকুম দিন জাঁহাপনা। এইরূপ ঔদ্ধত্য কিছুতেই বরদাশত্ করা যায় না।'

বাদশাহ্ সহসাই কোন হুকুম দিলেন না। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, ইহাকে কয়েদ করিয়া গোয়ালিয়র কেল্লায় প্রেরণ করা হোক।

আল্লাহ্পাকের নবী আ. গণ বিস্ময়কর সৃষ্টি। যুগে যুগে তাঁহারা ভ্রান্ত মানবকে পথের দিশা দেখাইতে গিয়া কতইনা দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। যে বিভ্রান্ত মানবগোষ্ঠীর কল্যাণ কামনায় তাঁহারা প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেন, তাহারাই তাঁহাদিগকে ভুল বুঝিয়া অথবা হিংসা দ্বেষের বশবর্তী হইয়া বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার করিতে থাকেন।

হজরত মোজাদ্দেদ র. উলুল আজম পয়গম্বরগণের কামালত বিশিষ্ট মোজাদ্দেদ। তাঁহার চরিত্রও তাই নবীসুলভ। গোয়ালিয়র কেল্লায় বন্দী হইয়া তাই তিনি বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরকে বদদোয়া করিলেন না। বরং আল্লাহ্পাকের ইচ্ছার প্রতি পরিপূর্ণরূপে সন্তুষ্ট রহিলেন। হজরত ইউসুফ আ. ও কারাবরণ করিয়াছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁহার সুন্নত প্রতিপালনের তৌফিক পাইয়া আল্লাহ্পাকের দরবারে শোকরিয়া আদায় করিলেন।

নূতন পরিবেশ। অদ্ভুত পরিবেশ। এখানে শুধু বন্দী আর বন্দী। শত শত চোর, ডাকাত ও অন্যান্য সামাজিক দুষ্কৃতকারীরা তাহাদের অপরাধের দায়ে এইখানে বন্দী জীবন কাটাইতেছে। কি উচ্ছৃঙ্খল তাহাদের জীবন। শয়তানের চক্রান্তে পড়িয়া তাহারা বিভ্রান্তির অগ্নিতে পুড়িয়া পুড়িয়া মরিতেছে। পথ দেখাইবার কেহ নাই। ভাল কথা বলিবার, সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই। মানবতার এই চরম অধঃপতন দেখিয়া হজরত মোজাদ্দেদ র. এর অন্তর কাঁদিয়া উঠিল। তিনি সমাজের চোখে এই সব ঘৃণিত ব্যক্তিদের এসলাহ্ করিবার কার্যে হাত দিলেন। ইহা তো তাঁহারই কাজ।

বন্দীদের বেশীর ভাগই ছিল কাফের। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাহাদেরকে ইসলামের নূরের সন্ধান দিলেন। পুষ্পের সৌরভ কখনও চাপা থাকেনা। 'মোজাদ্দেদ-কুসুম' ও সৌরভ ছড়াইতে লাগিল। সত্যের সৌরভে বন্দীগণের অন্তর ভরিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে তাহারা ইসলামের সুবাসিত হাওয়ায় প্রাণ ভরিয়া নিঃশ্বাস লইতে শুরু করিল। বন্দীশালা পরিণত হইল ইসলাম প্রচারের কেন্দ্রে।

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কারাবরণের সংবাদ ধীরে ধীরে সমস্ত খলিফা, মুরিদান ও ভক্তগণের নিকট পৌঁছিতে লাগিল। প্রিয় মোর্শেদের এই কষ্ট দেখিয়া

সবারই অন্তরে ক্ষোভের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে বাদশাহ্‌র সহিত যোগাযোগ করিয়া মোজাদ্দেদ র.কে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। খলিফাগণের মধ্যে কেহ কেহ বদদোয়া করিবার এজাজত চাহিয়া তাঁহার নিকট পত্র লিখিলেন। কিন্তু হজরত মোজাদ্দেদ র. কিছুতেই তাহার এজাজত দিলেন না। তাঁহার ছোট সাহেবজাদা হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র., মীর মোহাম্মদ নোমান র., শায়েখ বদিউদ্দিন র. প্রমুখ খলিফাগণকে তিনি বিভিন্নভাবে এই কারাবরণের প্রকৃত রহস্য উন্মোচন করিয়া সারগর্ভ নসিহতের মাধ্যমে প্রত্যেককেই আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছার প্রতি পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট থাকিবার নির্দেশ দিলেন।

তিনি সাহেবজাদা হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র.কে লিখিলেন, 'হামদ ও নাতের পর লিখিতেছি। হে প্রিয় বৎস্য! পরীক্ষার সময়টুকু কষ্টকর ও অসহনীয় হইলেও মূল্যবান, যদি ইহা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিবার ক্ষমতা পাওয়া যায়। যেহেতু আজকাল তোমার অবসরের সুযোগ মিলিয়াছে। আল্লাহ্‌পাকের শোকরিয়া আদায় পূর্বক নিজ কর্তব্য পালনে মনোনিবেশ কর। একটি মুহূর্তও যেন বিফলে না যায়।

সব সময় নিম্নলিখিত বিষয় তিনটির যে কোন একটিকে অজিফা বানাইয়া লও। (১) কোরআন শরীফ তেলাওয়াত, (২) দীর্ঘ কেরাতের সহিত নামাজ আদায় এবং (৩) কালেমা তাইয়েবা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর বিরতিহীন জিকির। লা কলেমার সাহায্যে নফসের মিথ্যা মাবুদগুলি অপসারিত কর। নিজের উদ্দেশ্য ও আকাংখিত বস্তু সমূহকে নিশ্চিহ্ন কর। নিজের আকাংখিত বস্তুর আকর্ষণ মিথ্যা মাবুদ ছাড়া কিছু নয়। হৃদয়ের প্রান্তরে যেন কোন ইচ্ছা-আকাংখা অবশিষ্ট না থাকে। এইখানেই বান্দার প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। নিজ আকংখা দ্বারা শুধু নিজ প্রভুর আকাংখা অবদমিত করা হয় এবং মাওলার ইচ্ছার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়। ইহা যেন প্রভুর হুকুমের বরখেলাফ করিয়া নিজেই প্রভুর স্থানে উপবেশন করার মত। এই অবস্থার কুফল গভীরভাবে চিন্তা করিয়া নফসের মাবুদ হইবার দাবীকে পূর্ণভাবে অপসারিত কর। আশা করি আল্লাহ্‌পাকের খাস রহমতে কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়া এই বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে অর্জন করিবার ক্ষমতা লাভ করিবে। পরীক্ষার সময় ছাড়া অন্যান্য সময়েও নিজের ইচ্ছা আকাংখাগুলি সেকেন্দারী প্রাচীরের মতো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আল্লাহ্‌পাক তোমাদিগকে শান্তির সহিত রাখুন। আমার সহিত তোমাদের মোলাকাতের সুযোগ হোক বা না হোক, আমার নসিহত এই যে, কোন আকাংখা বা লোভ লালসার অস্তিত্ব যেন অবশিষ্ট না থাকে। আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছা ও রেজামন্দি অনুযায়ী যেন সমস্ত কার্য সম্পাদিত হয়। এমনকি আমার কারামুক্তিও যেন তোমাদের কামনা না হয়। সম্প্রতি ইহাই তোমাদের বড় উদ্দেশ্য হইয়াছে। আল্লাহ্‌পাকের

সুনির্দিষ্ট তকদীর, তাঁহার ইচ্ছা ও মরজীর উপর পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হইয়া যাও। তোমার আম্মাকেও এই বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত করাইও।

এই জীবনের অন্যান্য বিষয়সমূহের লিপিবদ্ধ হইবার মত যোগ্যতা নাই– কেননা অচিরেই এই সব ধ্বংস হইয়া যাইবে। ছোটদের প্রতি স্নেহদৃষ্টি রাখিবে। তাহাদেরকে পড়াশুনার প্রতি উৎসাহিত কর এবং হকদারগণকে আমার তরফ হইতে যথাসম্ভব সন্তুষ্ট রাখিও। প্রাসাদ, কূপ, বাগ-বাগিচা এবং পুস্তকাদির চিন্তা বড় কিছু নয়। আমার মৃত্যু হইলেও ঐ সমস্ত হস্তচ্যুত হইত। এখন আমার জীবিত অবস্থাতেই ঐগুলি হস্তচ্যুত হইয়া যাইতেছে। চিন্তিত হইও না। আল্লাহ্পাকের দোস্তগণ ঐ সমস্ত বস্তুকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন। এখন আল্লাহপাক নিজেই উদ্যোগী হইয়া ঐ বস্তুসমূহকে দূর করিয়া দিয়াছেন। তাহার জন্য শোকর গোজারী করা কর্তব্য।

যে স্থানে বর্তমানে আছ সেই স্থানকেই মাতৃভূমি ভাবিও। মাত্র কয়েক দিনের জীবন। আল্লাহ্পাকের স্মরণের মধ্য দিয়া এই ক্ষুদ্র জীবন অতিবাহিত করা দরকার। দুনিয়ার কর্ম সহজ। আখেরাতের প্রতি মনোনিবেশ কর। তোমার আম্মাকেও সান্ত্বনা দিও এবং আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট করাইও। আল্লাহ্পাকের মর্জি হইলে পুনরায় আমরা মিলিত হইব। নতুবা তাঁহার হুকুমের উপর রাজি থাক এবং দোয়া কর, দুনিয়ার বিচ্ছেদের ক্ষতিপূরণস্বরূপ যেন বেহেশতে আমরা সকলেই একস্থানে অবস্থান করিতে পারি।'

বিপদ আপদ ও কষ্ট যন্ত্রণা আউলিয়া জীবনের সৌন্দর্য। 'অমা মিন্ নবীইন ইল্লা উজিয়া'– অর্থাৎ এমন কোন নবী নাই যাহাকে আল্লাহ্র পথে মুসিবত সহ্য না করিতে হয়। জালালী সায়ের ছাড়া আল্লাহ্প্রাপ্তি পূর্ণতা হাসিল হয়না। 'অল বালাও বিকদরীল অলায়'– অর্থাৎ এমন কোন অলি নাই যাহাকে বিপদ সহ্য করিতে না হয়। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর অবস্থাও কার্যকলাপ অলিগনের কার্যকলাপ হইতে বহু উর্ধ্বে। তাঁহার প্রতি আপতিত বিপদের ধরন ও বৈশিষ্ট তাই অতি উচ্চমানের। ভালবাসার তারতম্য অনুপাতে বিপদ আসে। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কারাবরণ, তাঁহার অবর্ণনীয় আল্লাহ্ প্রেমের প্রতিফল ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত প্রেমিক তাই বিপদে কষ্ট পান না। বরং আরও বেশী পরিমাণে আনন্দিত হন। কারণ তাঁহারা জানেন যে, ইহা প্রেমাষ্পদেরই দান। তিনি শায়েখ বদিউদ্দিনকে এই কথা জানাইয়া লিখিলেন ঃ

'শেখ ফতহুল্লার মারফত আপনার পত্র হস্তগত হইল। পত্রে সৃষ্ট-জীবের প্রতি জুলুম ও নিষ্পেষণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উক্ত বস্তুগুলি আউলিয়ার অলংকার এবং তাঁহাদের মরীচিকা জাল অতিক্রম করিবার হাতিয়ার। কাজেই ইহাতে আপনার মনোকষ্টের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

এই দুর্গে ফকিরের প্রথম আগমনের সময় অনুভূত হইত, জনসাধারণের বিদ্রূপের আলো শহর ও গ্রাম হইতে উচ্চ হইয়া নূরানী মেঘের মত ক্রমান্বয়ে আমার নিকট উপস্থিত হইতেছে এবং আমার বিষয়টি নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে লইয়া যাইতেছে। আমি বহু বৎসর এই দূরত্বকে জামালী তরবিয়তের মাধ্যমে অতিক্রম করিয়াছিলাম। এখন এই স্তরসমূহ অতিক্রমনের কার্য জালালী তরবিয়তের মাধ্যমে সম্পন্ন হইতেছে। সবর ও রেজার স্তরে অবস্থান করুন। জামালী ও জালালীকে সমান ধারণা করুন।

আপনি লিখিয়াছিলেন যে, 'এই ফেতনার কারণে আমার মধ্যে কোন যওক ও হাল নাই।' অথচ যওক ও হালের মধ্যে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উন্নতি কাম্য ছিল। কেননা মাশুকের ইশক অপেক্ষা জুলুমই অধিকতর আনন্দদায়ক।

কি হইল আপনার? আপনার কথা যে সাধারণ মানুষের মত শোনাইতেছে! আপনি আল্লাহ্‌র জাতি মহব্বত হইতে দূরবর্তী হইয়াছেন। যাহা হউক অতীতের ভ্রান্তি আগামীতে সংশোধন করিয়া জালালকে জামাল হইতে উত্তম ধারণা করুন এবং পুরস্কার অপেক্ষা কষ্টকে পছন্দ করিতে শিখুন। কেননা জামালের ক্ষেত্রে মাশুকের ইচ্ছার সহিত নিজেরও কামনা মিশ্রিত থাকে এবং জালালের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মাশুকের ইচ্ছা বর্তমান থাকে। ইহাতে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করা হয়।'

তিনি হজরত মীর মোহাম্মদ নোমান র. এর নিকট লিখিলেনঃ 'জানিতে পারিলাম যে, হিতাকাংখী বন্ধুগণ আমার মুক্তির ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালাইয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। আল্লাহ্‌পাকের কার্যাবলী সমস্তই মঙ্গলময়। মানুষ হিসাবে অবশ্য কিঞ্চিৎ কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, সুখ ও শান্তির রূপ পরিগ্রহ করিল। বিশ্বাস আসিল যে, এই দল আমাকে কষ্ট দিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের উদ্দেশ্য যখন আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছার অনুকূল– তখন মনোবেদনা, দুঃখ-কষ্ট নিরর্থক এবং ইহা প্রেমের দাবীর সম্পূর্ণ বিপরীত।

প্রেমাস্পদের প্রতিটি কার্যই প্রিয়। তাঁহার দান ও পুরস্কার যেরূপ আনন্দময়– তেমনই তাঁহার নিকট হইতে আগত দুঃখ কষ্টও সুখকর। বরং দুঃখ-কষ্টই অধিক আনন্দ প্রদানকারী।

সত্যিই– আল্লাহ্‌পাকের কার্যাবলী বড়ই সৌন্দর্যময়। এই নিকৃষ্ট অভাজনকে দুঃখ-কষ্ট দেওয়াই যখন তাঁহার মর্জি তখন এই অধম ও তাঁহার দানেই সন্তুষ্ট। বরং ইহাতে সে সুখ অনুভব করিতেছে। আল্লাহ্‌পাকের উদ্দেশ্য যদি বাদশাহ্‌র উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহা হইলে এই অধম, তাঁহাদের কামনাকেই উত্তম ও আনন্দময় দেখিবেনা কেন?

কোন ব্যক্তির কার্যে যদি মাশুকের কার্য বিকশিত হয়– তাহা মাশুকের কার্য বলিয়াই অনুভূত হয় এবং মাশুকের কার্যের মতই ইহা সুখ প্রদান করে।

ইহা বড়ই বিস্ময়কর বিষয়। কোন ব্যক্তি কর্তৃক অত্যাচার যতই বৃদ্ধি পায় আশেক তাহাতে ততই সুখ অনুভব করে। কেননা ইহাতে মাশুকের ক্রোধের রূপবৈচিত্র প্রকাশিত হয়। প্রেমের পথের পথিকদের নিয়ম-কানুনই স্বতন্ত্র্য। এই কারণে সেই ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া এবং তাহার অকল্যাণ কামনা করা প্রেমের রীতিবিরুদ্ধ কার্য।

সেই ব্যক্তির পরিচয় কি? তাহার হকিকতই বা কি? সে যে কেবল প্রেমাস্পদের কার্যের দর্পন ছাড়া আর কিছুই নয়। যাহারা অত্যাচার করিবার কার্যে নিয়োজিত থাকে– মখলুকের মধ্যে তাহাদিগকেই সর্বাধিক প্রিয় মনে হয়।

দোস্তগণকে হৃদয়ের সংকীর্ণতা অপসারিত করিতে বলিবেন এবং ঐ দলকে কষ্ট প্রদান করিবার চিন্তা হইতে মুক্ত থাকিবার কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন। বরং তাহাদের কার্যকলাপ হইতে আনন্দ লাভের চেষ্টা করিতে বলিবেন।

অবশ্য আমাদের প্রতি দোয়া করিবার আদেশ হইয়াছে। তাই আল্লাহ্পাকের দরবারে বিনয় ও ক্রন্দনের সহিত দোয়া করা কর্তব্য।

মনে রাখিবেন, প্রকৃত গজব আল্লাহ্পাকের দুশমনদের জন্য নির্ধারিত। আল্লাহ্পাকের আশেকদের জন্য উহা অবিকল রহমত– যদিও তাহা বাহ্যিক দৃষ্টিতে গজব বলিয়া অনুভূত হয়। ইহার দ্বারা এত কল্যাণ সাধিত হয় যাহার প্রকৃত বর্ণনা সম্ভব নয়। এই গজবের বাহ্যিক অবয়বের মধ্যেও বিরুদ্ধবাদীদের অকল্যাণ নিহিত এবং ইহা পরীক্ষার কারণ।

শেখ মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী র. বলিয়াছেন, 'আল্লাহ্পাকের আশেক হিম্মতহীন'– অর্থাৎ কোনপ্রকার দুঃখ-কষ্টে পতিত হইলে সে উহা দূরীভূত করিবার ইচ্ছা করে না। কেননা আশেক মনে করে, তাঁহার প্রতি আরোপিত দুঃখ-কষ্ট প্রেমাস্পদের ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার দিক হইতেই আসিতেছে। কাজেই বেচারা আশেক কেমন করিয়া উহা অপসারণের চিন্তা করিবে। যদিও সে দোয়ার হুকুম পালন করিবার জন্য বাহ্যিকভাবে দোয়া করিবে কিন্তু উহা তাহার ইচ্ছা নয়। কারণ সে আন্তরিকভাবে প্রেমাস্পদেরই কামনা অভিলাষী।'

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর কারাজীবনের কার্যকলাপের সংবাদ বাদশাহ্‌র নিকট পৌঁছিতে লাগিল। তিনি শুনিলেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. কারাগারের অপরাধী কাফেরগণকে মুসলমান বানাইতেছেন। তাঁহার খলিফাগণকে তিনি কোন প্রকার বদদোয়া করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন। এমনকি কারাজীবনের বিন্দু পরিমাণ প্রতিক্রিয়াও তাঁহার উপর পড়ে নাই। বরং ইহাকে আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছা মনে করিয়া খুশী হইয়াছেন। বাদশাহ্‌ তাঁহার সেরহিন্দের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার হুকুম দিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি পুত্র পরিজনদের প্রতি এই কারণে অসন্তুষ্ট হইতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি নাকি বলিয়াছেন, এই সমস্ত অস্থায়ী বস্তুর মূল্য এমন কিছু নয়, যাহার জন্য হৃদয় বিচলিত হইতে পারে। বাদশাহ্‌ ভাবিলেন, এই মানুষটি কি? প্রতিশোধ গ্রহণের তাঁহার যে বিন্দু পরিমাণ ইচ্ছা নাই। অথচ ইচ্ছা করিলেই তিনি এখন রাজ্যময় লক্ষ লক্ষ মুরিদানের সাহায্যে বিরাট বিশৃংখলা সৃষ্টি করিতে পারেন। বাদশাহ্‌ বিস্মিত হইলেন। তবে কি আসফ খানের দলের লোকজনদের আশংকা মিথ্যা? হজরত মোজাদ্দেদ র. সত্যিই তাঁহার অমংগল কামনা করেন না? বাদশাহ্‌ ভাবিতে লাগিলেন– তবে কি তিনি অন্যায় করিয়াছেন? আল্লাহ্‌র ফকিরকে অন্যায়ভাবে কয়েদ করিয়াছেন?

বাদশাহ্‌ ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহাকে মুক্তি দেয়া যায় কি না। সহসা একদিন সংবাদ আসিল, হজরত মোজাদ্দেদ র. এর ভক্ত আমিরগণ মহব্বত খানের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। এক বিরাট সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহের পতাকাতলে সম্মিলিত হইয়াছে। তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হইয়াছেন। বাদশাহ্‌র চিন্তায় প্রবলভাবে আঘাত লাগিল। তাঁহার দাম্ভিকতা মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। বিদ্রোহীদিগকে চরম শিক্ষা দিতে হইবে। বাদশাহ্‌ যুদ্ধের জন্য হুকুম দিলেন। সৈন্যদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। অশ্ববাহিনী, হস্তিবাহিনী, পদাতিক বাহিনী সমস্তই প্রস্তুত হইয়া গেল। বিপুল সংখ্যক সৈন্য বিদ্রোহীদেরকে শায়েস্তা করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে চলিল।

আসফ খান-এর দল বাদশাহ্‌কে পরামর্শ দিলেন, 'যুদ্ধযাত্রার পূর্বে শায়েখ আহমদকে কতল করা প্রয়োজন। তাহা হইলে বিদ্রোহীদের মনোবল ভাংগিয়া

যাইবে এবং তাহাদিগকে পরাজিত করাও সহজ হইবে।' কিন্তু বাদশাহ্ এই সিদ্ধান্তে রাজী হইলেন না। কারণ তাহা হইলে বিদ্রোহীগণ আরও বেশী ক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে এবং সাম্রাজ্যব্যাপী চরম বিশৃংখলা সৃষ্টি করিবে। ইহাতে পরিস্থিতি হয়তো নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যাইবে। তাই সর্বপ্রথম মহব্বত খানের দলকে পরাভূত করিবার পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত করিতে হইবে। শায়েখ আহমদকে কতলের বিষয়ে পরে চিন্তা করা যাইবে।

বাদশাহ্ নিজে সেনাপতি সাজিলেন। বিশাল সেনাবাহিনী সহকারে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইলেন।

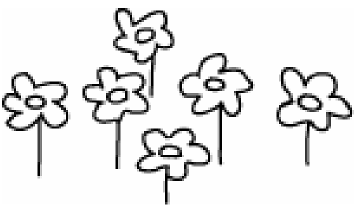

ইনকেলাব! ইনকেলাব!

সাম্রাজ্যব্যাপী বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া এই বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলিতেছিল। যে সমস্ত আমিরগণকে বাদশাহ্ আসফ খানের চক্রান্তে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তার ভার দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কারাবরণের সংবাদ শুনিয়া অস্থির হইয়া গেলেন। প্রিয় মোর্শেদের প্রতি এই অত্যাচারের সংবাদে তাঁহাদের অন্তরে ক্ষোভের অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহারা পরস্পর চিঠিপত্র আদান প্রদানের মাধ্যমে এই গুরুতর সমস্যা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহারা সিদ্ধান্তে আসিলেন যে, বাদশাহ্র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে হইবে। কারণ বাদশাহ্ ও তাঁহার দল হজরত মোজাদ্দেদ র.কে কয়েদ করিবার ষড়যন্ত্র পূর্বেই করিয়াছিল এবং এই কাজ যাহাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তাই তাঁহাদেরকে রাজধানী হইতে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিদ্রোহ করা ছাড়া এখন আর কোন উপায় নাই। শাহী প্রাসাদে জঘন্য চক্রান্ত চলিতেছে। সেই চক্রান্ত সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করিয়া দিতে হইবে।

এই সিদ্ধান্তের পর যুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতে লাগিল। বিভিন্ন স্থান হইতে সৈন্য আসিয়া কাবুলে সমবেত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে এই সমাবেশ এক বিশাল সেনাবাহিনীতে পরিণত হইল। এই সেনাবাহিনীর সেনাপতি হইলেন মহব্বত খান।

মহব্বত খান খোৎবা হইতে বাদশাহ্‌র নাম বাদ দিবার নির্দেশ দিলেন এবং মুদ্রা হইতেও বাদশাহ্‌র নাম উঠাইয়া দিলেন। অতঃপর যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তাহার পর তিনি তাঁহার বিশাল বাহিনী লইয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বিশাল মোজাহিদ বাহিনী আগাইয়া চলিয়াছে। সবারই মুখে সত্যের দীপ্তি জ্বল জ্বল করিতেছে। অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রাম। অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর যুদ্ধ। মোঘল বাদশাহ্‌র অহংকার ধূলায় মিশাইয়া দিতে হইবে। প্রিয় মোর্শেদের প্রতি অত্যাচারের সমুচিত শিক্ষা দিতে হইবে।

ঝীলাম নদীর তীর।

উভয় বাহিনী সামনা-সামনি দাঁড়াইল। একদিকে শাহী বাহিনী। সেনাপতি স্বয়ং বাদশাহ্‌। অপরদিকে বিদ্রোহী বাহিনী। সেনাপতি হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর সাচ্চা মুরিদ মহব্বত খান।

যুদ্ধ শুরু হইল। শাহী বাহিনী বিদ্রোহী বাহিনীকে আক্রমণ করিল। বাদশাহ্‌ বীর বিক্রমে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন মহব্বত খানের উপর। মহব্বত খান প্রতি আক্রমণ না করিয়া কৌশলমূলক পলায়ন করিলেন। বাদশাহ্‌ তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। শাহী বাহিনীর মধ্যে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর অনেক ভক্ত ছিলেন। বাদশাহ্‌র তাহা জানা ছিল না। তিনি যখন নিজ বাহিনী হইতে দূরে চলিয়া গেলেন তখন মহব্বত খান উভয় বাহিনীর মোজাদ্দেদ-ভক্তদের সহায়তায় সহজেই বাদশাহ্‌কে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং বন্দী করিলেন।

শাহী বাহিনী পরাজিত হইল। বাদশাহ্‌ বন্দী হইলেন। মহব্বত খানের সমস্ত সৈন্যদের মনে বিজয়ের আনন্দ। সবারই মনে আশা, এইবার দিল্লীর মসনদে তাঁহারা হজরত মোজাদ্দেদ র.কে উপবেশন করাইবেন। মহব্বত খানের অন্তরেও সেই আশা। তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর নির্দেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তিন দিন কাটিয়া গেল। অবশেষে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর নির্দেশ আসিল, 'ফেতনা ফাসাদ বন্ধ করুন। বিশৃংখলা আমার কাম্য নয়। পূর্বের মত বাদশাহ্‌র অনুগত হইয়া চলুন।'

মহব্বত খানের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কোন বাধা নাই, বিপত্তি নাই। দিল্লীর মসনদ শূন্য। ইচ্ছা করিলেই উহাতে আরোহণ করা যায়। কিন্তু কি করা যাইবে। প্রিয় মোর্শেদের হুকুম। মহব্বত খান তাঁহার ইচ্ছাকেই শিরোধার্য করিয়া লইলেন। তিনি তো তাঁহার গোলাম ব্যতীত কিছু নহেন। প্রেমাস্পদের ইচ্ছানুযায়ী কার্য করাই প্রেমিকের কাজ। তিনি তো মোজাদ্দেদ-কুসুমের আশেক ছাড়া আর কিছুই নহেন।

যে জন যাহার প্রেমে হয়েছে বিলীন,
সে জন নিশ্চয় হইবে তাঁহার অধীন।

মহব্বত খান বাদশাহ্কে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং প্রিয় মোর্শেদের নির্দেশ তাঁহাকে জানাইয়া দিয়া পূর্বের মত শাহী আনুগত্যের সহিত কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শুধু তাজিমি সেজদা করিলেন না।

নূতন বিচিত্র এক অভিজ্ঞতা লইয়া বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। পরাজিত হইয়াও তিনি জয়লাভ করিলেন। বন্দী হইয়াও সসম্মানে মুক্তি পাইলেন। এ কেমন বিস্ময়!

সম্প্রতি বাদশাহ্ যেন কেমন হইয়া গিয়াছেন। যুদ্ধে তিনি কি সত্যিই জয়লাভ করিয়াছেন? ইহা কি জয় না পরাজয়? প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া তিনি যাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে তিন দিনও বন্দী থাকিতে দিলেন না। কিইবা তাঁহার অপরাধ ছিল? শাহী আদব কি মানবতা অপেক্ষা বড়? প্রতিটি ঘটনায় যিনি প্রমাণ করিয়াছেন, দুনিয়ার কোন প্রকার শানশওকতের বিন্দু পরিমাণ মোহও তাঁহার নাই– সেই নির্লোভ নির্মোহ আল্লাহ্র ফকিরকে বন্দী করিবার কি অধিকার তাঁহার আছে? তিনি যাঁহাকে কষ্ট দিয়াছেন সেই আল্লাহ্র ফকির বরাবরই তাঁহার কল্যাণ কামনা করিয়াছেন। তিনি যাঁহাকে গৃহচ্যুত করিয়াছেন– সেই আল্লাহর বন্ধু তাঁহার হৃত সিংহাসন নির্দ্বিধায় ফেরত দিয়াছেন। পরাজয়, তাঁহারই শোচনীয় পরাজয় হইয়াছে। বাদশাহ্র মোঘল দাম্ভিকতা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। বিশাল হিন্দুস্তানের বাদশাহ্ হইয়াও তাঁহার অন্তর কত সংকীর্ণ। আর নিঃসম্বল কারাযন্ত্রণাভোগকারী ফকির হইয়াও হজরত মোজাদ্দেদ র. এর অন্তর কত বিশাল। প্রকৃতপক্ষে ফকিরগণই বাদশ্াহ। বাদশাহ্র অন্তরে অনুতাপের অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

শাহজাদা শাহজাহান বহুদিন হইতে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মুক্তির জন্য সুপারিশ করিতেছিলেন। বাদশাহ্ও এবার ভাবিলেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. কে মুক্তি দিতে হইবে। সত্য বুঝিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছে। আর নয়। বাদশাহ্ হজরত মোজাদ্দেদ র.কে মুক্তির আদেশ প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে শাহী দরবারে তশরীফ আনিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন।

হজরত মোজাদ্দেদ র. মুক্ত হইলেন। কিন্তু বাদশাহ্র সহিত সাক্ষাতের পূর্বে তিনি সাতটি শর্ত প্রদান করিলেন। তিনি জানাইলেন, শর্তগুলি মানিয়া লইলে তিনি বাদশাহ্র সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত আছেন।

শর্তসমূহ ঃ

১. দরবার হইতে তাজিমি সেজদার প্রচলন উঠাইয়া দিতে হইবে।
২. ভগ্ন ও বিরান মসজিদ সমূহ আবাদ করিতে হইবে।
৩. গরু জবেহ্ করিবার উপর যে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে, তাহা রহিত করিতে হইবে।
৪. ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য বিভিন্ন স্থানে কাজী, মুফতি নিয়োগ করিতে হইবে।
৫. জিজিয়া কর পুনরায় প্রবর্তন করিতে হইবে।
৬. সকল প্রকার বেদাত কার্যকলাপ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।
৭. রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হইবে।

বাদশাহ্ সমস্ত শর্তসমূহ নির্দ্বিধায় মানিয়া লইলেন। শর্তসমূহ বাস্তবায়িত করিবার জন্য শাহী ফরমান জারী করা হইল। তাজিমি সেজদা বন্ধ হইল। গরু জবেহ্ এর উপর নিষেধাজ্ঞা আর রহিল না। জিজিয়া কর পূনঃপ্রবর্তিত হইল। সকল প্রকার বেদাত কার্যকলাপ কঠোর হস্তে দমন করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল। শরীয়তভিত্তিক বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য স্থানে স্থানে কাজী নিয়োগ করা হইল। শহর ও গ্রামে মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইল। বাদশাহ্ নিজেও আম দরবারের সম্মুখে একটি মসজিদ নির্মাণ করাইলেন।

হজরত মোজাদ্দেদ র. বাদশাহ্র সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজধানী আসিলেন। বাদশাহ্ মহাসমাদরের সহিত স্বসম্মানে তাঁহাকে দরবারে লইয়া গেলেন। বাদশাহ্ তাঁহার নিকট নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া মাফ চাহিলেন। অতঃপর হজরত মোজাদ্দেদ র. এর পবিত্র হস্তে বায়াত গ্রহণ করিলেন। শাহাজাদা শাহজাহানকেও তাঁহার পবিত্র খানকায় ভর্তি করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন।

নামাজের ওয়াক্ত হইল। মোয়াজ্জিন আজান দিলেন, আল্লাহু আকবর-আল্লাহু আকবর... মোয়াজ্জিনের কণ্ঠে আবার সুর ফিরিয়া আসিয়াছে। দীর্ঘ তমসাবৃত প্রান্তর অতিক্রম করিয়া আবার চতুর্দিকে ইসলামের আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্– আমি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারো উপাসনা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা নাই। ইয়া আল্লাহ্ তুমি, শুধু তুমিই একমাত্র উপাস্য। আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসুলুল্লাহ্। নিশ্চয় মোহাম্মদ আল্লাহ্র রসুল– আমি সাক্ষী আছি– নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত রসুল। হাইয়্যাআ'লাস সালাহ...আহা! সালাত! হে মুসলমানগণ, নামাজ আল্লাহ্প্রদত্ত

সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত, নামাজের জন্য অগ্রসর হও। হাইয়্যালাল ফালাহ্....তুমি জান নাকি ইহাতেই প্রকৃত কল্যাণ– কল্যাণের জন্য অগ্রসর হও। আল্লাহু আকবর-আল্লাহু আকবর...আল্লাহ্ মহান-আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ছাড়া উপাস্য কেহই নাই। লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ ।

হজরত মোজাদ্দেদ র. এবং বাদশাহ্ নবনির্মিত মসজিদে আসিয়া নামাজ আদায় করিলেন। কাইয়ুমে জামান ইমামে রব্বানী হজরত মোজাদ্দেদ আলফে সানি শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দি র. হইলেন ইমাম– আর বিশাল হিন্দুস্তানের বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর হইলেন তাঁহার মোক্তাদী।

নূরজাহানের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার সমস্ত পরিকল্পনাই যে ব্যর্থ হইয়া গেল। যে নকশবন্দিয়া তরিকা ও তাহার প্রচার চিরতরে দুনিয়া হইতে সরাইয়া দিবার পরিকল্পনা তিনি করিয়াছিলেন– শাহী দরবারেও সেই তরিকা বিজয় গৌরবে প্রবেশ করিল। বাদশাহ্ নিজেও পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন করিলেন সেরহিন্দের সেই ফকিরের কাছে। কিন্তু নূরজাহান তবুও হাল ছাড়িলেন না। যত কিছুই হোক– শাহজাহানকে মসনদে কিছুতেই বসিতে দেওয়া যাইবে না। নূরজাহান শাহজাদা সম্পর্কে ক্রমাগত বাদশাহ্‌র অন্তরে বিষ ঢালিতেই লাগিলেন। বাদশাহ্ আশেক মানুষ। স্ত্রীপ্রেমে তিনি বরাবরই অন্ধ। নূরজাহানের কারসাজিতে শাহজাদার প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন। দিল্লীর মসনদে বসিবার যোগ্যতা যে শাহজাহানের নাই, স্ত্রীর কথায় এই ধারণাও তাঁহার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গেল।

শাহজাদা অনেক চেষ্টা করিলেন, বাদশাহ্‌র ভুল ভাঙ্গাইবার জন্য। কিন্তু কিছুতেই পিতার মন গলাইতে পারিলেন না। পরিস্থিতি এমন আকার ধারণ করিল যে, পিতার নিকট তাঁহার কোনই স্থান রহিল না। শেষ পর্যন্ত শাহজাদা বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

পিতাপুত্রে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নওজোয়ান শাহজাদার বাহিনী অনেক শক্তিশালী। বাদশাহ্‌র পরাজয় হয় হয়। বাদশাহ্ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর নিকট দোয়া চাহিলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. দোয়া করিলেন। সহসা পরিস্থিতি বিপরীত মোড় লইল। শাহজাদার শক্তিশালী বাহিনী পরাজিত হইল। শাহজাদা জানিতে

পারিলেন, হজরত মোজাদ্দেদ র.এর দোয়ার ফলেই পরিস্থিতির এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, 'হজরত, আমিতো আমার পিতার পূর্ব হইতে আপনার গোলাম। কি কারণে আপনি আমার প্রতি বিরূপ হইয়া আমার বিরুদ্ধে দোয়া করিলেন। আপনার কারামুক্তির জন্য আমি পিতার নিকট কতভাবে চেষ্টা তদবির করিয়াছি।'

হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁহাকে শান্ত হইবার উপদেশ দিয়া বলিলেন, 'আর বিলম্ব নাই। কোন প্রকার চিন্তা করিওনা। অল্পকাল পরেই তোমার পিতার জাহিরী মসনদ তোমার করতলগত হইবে। আর আমার বাতেনী মসনদে অধিষ্ঠিত হইবে আমার পুত্র মোহাম্মদ মাসুম।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর বয়স তেষট্টি বৎসরে পড়িয়াছে। তেষট্টি বৎসর। বিগত জীবনের কর্মচাঞ্চল্য যেন অনেকটা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে– আর কতদূর? কার্য তো শেষ হইল। কর্মময় জীবনের মনে হয় সমাপ্তি ঘটিয়াছে। দ্বিতীয় হাজার বৎসরের মোজাদ্দেদ হিসাবে তাঁহার সংস্কারের পূর্ণতা সাধিত হইয়াছে। বেদাত কুফরি নাস্তিকতার শক্তি পর্যুদস্ত হইয়াছে। সারা সাম্রাজ্যব্যাপী ইসলামের সুশীতল সমীরণ বহিয়া যাইতেছে। তাঁহার পাঁচ হাজার খলিফা দেশের বিভিন্ন স্থানে অতন্দ্র প্রহরীর মত সমগ্র মুসলিম সমাজকে সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার কাজে নিযুক্ত। শুধু দেশে নয়। বোখারা,সমরখন্দ, ইয়েমেন, মদিনা মনওয়ারা সর্বত্র তিনি খলিফা প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই মোজাদ্দেদি নূর প্রজ্জ্বলিত করিয়া শয়তানি হুকুমতের অবসান ঘটাইতেছেন। সর্বত্র সফলতা। চরম সফলতার আলোয় পৃথিবী ভরিয়া গিয়াছে।

হজরত রসুলেপাক স. তেষট্টি বৎসর বয়সে নশ্বর এই দুনিয়া হইতে পর্দা করিয়াছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর বয়সও তেষট্টি বৎসরে পড়িয়াছে। তবে কি এইবার প্রবাসী জীবনের অবসান ঘটিবে? তবে কি এইবার ঘরে ফিরিবার সময় হইয়াছে?

সবই হইল। কিন্তু কাবা দর্শন বুঝি আর ভাগ্যে জুটিল না। আল্লাহ্পাক মেহেরবাণী করিয়া কাবার হকিকতের সহিত তাঁহাকে মিলিত করিয়াছেন এবং

তাহার গুঢ় রহস্যসমূহ তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কি করা যাইবে– সুরত যে সুরতকে দেখিবার জন্য পাগল হয়। সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করিতে গিয়া হজ করিবার অবসর আর মিলিল না। কাবামিলনের লগ্ন আর আসিল না। তাহাই হোক– আল্লাহ্‌পাকের যাহা ইচ্ছা। যে বিরহ আল্লাহ্‌পাকের পছন্দনীয় শত সহস্র মিলন তাহার নিকট কিছুই নয়।

বিরহ দেওয়াই যদি হয় প্রভুর বাসনা–
চাহিনা মিলনসুখ, রুদ্ধ রসনা।

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর হৃদয়ে কত স্মৃতি জাগরিত হইল। সেরহিন্দের বাল্যকাল। শিক্ষাদীক্ষা। পিতা ও পীর শায়েখ আব্দুল আহাদ র.। কতই না ব্যস্ততা ছিল তাঁহার নকশবন্দি মারেফত অর্জনের জন্য। আজ সমস্ত হিন্দুস্তানের কোণায় কোণায় নক্‌শবন্দি নূর প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে– কিন্তু তিনি নাই। তারপর সেই নক্‌শবন্দি স্ফুলিঙ্গ হজরত খাজা বাকি বিল্লাহ র.। প্রিয় মোর্শেদ। দিল্লীর কদম রসূলের নিকট তিনিও শায়িত। সবাই যায়। এমনি করিয়া সবাই চলিয়া যায়। আল্লাহ্‌পাকের কত দয়া। রসুলুল্লাহ্ র. এর কত মেহেরবাণী। তারপর দ্বিতীয় হাজার বৎসরের মোজাদ্দেদের দায়িত্ব আসিল। কি দোর্দণ্ড প্রতাপ মোঘল সালতানাতের। কি কুফরীর অন্ধকারেই না নিমজ্জিত ছিল বাদশাহ্‌গণ। সে প্রবল শাহী পরাক্রমকে তাঁহার নিকট আল্লাহ্‌পাক পরাজিত করাইলেন। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর। বড়ই উত্তম ব্যক্তি। আল্লাহ্‌পাক তাঁহাকে উত্তমরূপে পুরস্কৃত করুন। শরীয়ত তলোয়ারের নীচে। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরকে দিয়া আল্লাহ্‌পাক শরীয়তের তলোয়ার উদ্যত করাইয়াছেন। সমস্ত সাম্রাজ্যে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌পাকের নিকট সমস্তই সহজ। সমস্ত প্রশংসাই তাঁহার। মাটির মানুষের প্রতি তাঁহার দয়ার যে সীমা পরিসীমা নাই।

হজরত মোজাদ্দেদ র. মাঝে মাঝে আনমনা হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'তেষট্টি বৎসর। আমার বয়স তেষট্টি বৎসরে পড়িয়াছে।'

শাবান মাস আসিল। পনেরই শাবানের রাত্রিতে তিনি অভ্যাসানুযায়ী নির্জন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত রাত্রি ইবাদতের মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল। প্রভাতে তিনি শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। বিবি সাহেবা ফরমাইলেন, 'আজ কাহাদের নাম যে হাস্তির দফতর হইতে মুছিয়া গেল– কে বলিতে পারে?'

হজরত মোজাদ্দেদ র. বলিলেন, 'তুমিতো ইহা না জানিয়াই বলিতেছ। কিন্তু ঐ ব্যক্তির কি অবস্থা হইবে, যিনি তাঁহার নিজের নাম স্বচক্ষে হাস্তির দফতর হইতে মুছিয়া যাইতে দেখিলেন।

হজরত মোজাদ্দেদ র. আখেরাতে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া গেলেন। এরশাদ ও হেদায়েতের ভার পুত্রগণের উপর অর্পণ করিলেন। ইহার পর খাছ কামরায় প্রবেশ করিয়া কোরআন শরীফ তেলাওয়াত, মোরাকাবা মোশাহাদা, জিকির আজকারের মধ্যে দিয়া তিনি সময় কাটাইতে লাগিলেন। শুধুমাত্র নামাজের সময় তিনি বাহিরে আসিতেন এবং জামাতের সহিত নামাজ আদায় করিতেন। তিনি নফল রোজা, ছদকা খয়রাতের পরিমাণও বাড়াইয়া দিলেন।

দেখিতে দেখিতে ঈদুল আজহা আসিয়া গেল। হজরত মোজাদ্দেদ র. ঈদের জামাতে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে সারগর্ভ নসিহত করিলেন। নামাজ আদায় শেষে গৃহে তশরীফ আনিলেন। খলিফা ও মুরিদগণকে ডাকিয়া বলিলেন,'রসূলে পাক স. তেষট্টি বৎসর বয়সে নশ্বর এই দুনিয়া হইতে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। আমার বয়সও তেষট্টি পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। ঐ সময় বড়ই নিকটবর্তী যখন আমিও রফিকে আলার নিকট প্রত্যাবর্তন করিব। তোমাদের মূল কর্তব্য হইল, আল্লাহ্‌র কিতাব ও রসুলুল্লাহ্‌ স. এর সুন্নত অনুযায়ী আমল করা। ইহাই প্রকৃত কার্য। অন্য সমস্তই নিরর্থক।'

জিলহজ মাসের মাঝামাঝি তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। হাঁপানীসহ ভীষণ জ্বর দেখা দিল। রোগ দিন দিন বাড়িয়াই চলিল। একদিন তিনি বলিলেন, 'পীরানে পীর রহমতুল্লহি আলায়হির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট।'

জিলহজ মাস শেষ হইল। হিজরী ১০৩৩ সাল পূর্ণ হইল। মহরম মাস সূচনা করিল ১০৩৪ হিজরীর। ১২ই মহরম তিনি বলিলেন, 'আর বিলম্ব নাই। আর মাত্র চল্লিশ পঞ্চাশ দিন। তারপর সেই শুভলগ্ন। বিরহ যাতনার অবসান হইবে। আহা! যন্ত্রণার রজনীর সমাপ্তি ঘটিবে।'

সহিতে পারে না আঁখি অতি সূক্ষ্মকণা।
বন্ধুর বিরহ নয় সামান্য যাতনা।
অন্তরের গভীরে শুধু 'আরেনি, আরেনি,'
মিটিবে পিপাসা এবার– নিভিবে অশনি।

একদিন তিনি ওয়ালেদ মাজেদের রওজা মোবারকে জেয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। রওজা মোবারকের পাশে বসিয়া দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া তিনি মোরাকাবা করিলেন। কবরস্থানের অন্যান্য কবরবাসীগণের জন্যও আল্লাহ্পাকের দরবারে মাগফেরাত কামনা করিলেন। সেখান হইতে ইমাম রফিউদ্দিন র. এর রওজা মোবারকে গমন করিলেন। ইনিই এই মোজাদ্দেদ র. এর পূর্ব পুরুষ– তাঁহার প্রপিতামহ।

হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁহার কবরের পাশেও অনেকক্ষণ যাবৎ মোরাকাবায় মশগুল রহিলেন। অন্যান্য কবরবাসীর মাগফেরাতের জন্যও দোয়া করিলেন। এখন কবরবাসীগণই যেন তাঁহার বেশী আপন হইয়াছে। দুনিয়াবাসীগণ হইতে তিনি বহুদূরে সরিয়া গিয়াছেন। বুজর্গ পূর্বপুরুষগণের নিকট গিয়া তিনি যেন জানাইয়া দিলেন, 'দেরী নাই। আর বেশী বিলম্ব নাই। কয়েকদিন মাত্র আর। কয়েকদিন মাত্র। তাহার পরই আমাকে আপনাদের সঙ্গে হিসাবে পাইবেন। এইতো, আর মাত্র কয়েকদিন।'

হজরত মোজাদ্দেদ র. গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ২২শে সফর তিনি পুত্রগণ ও মুরিদগণকে ডাকিয়া বলিলেন, 'একজন মানুষকে যাহা কিছু দান করা সম্ভব, আল্লাহ্পাক তাহার সমস্তই আমাকে দান করিয়াছেন।' উপস্থিত সবাই এ কথা শুনিয়া শরাহত পাখির মত নিশ্চুপ দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রিয় মোর্শেদের বিয়োগব্যথায় সবারই অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল। কিন্তু কিছুইতো করিবার উপায় নাই। মৃত্যু যে মানব জীবনে এক চরম সত্য। শুধু আল্লাহ্পাক ছাড়া কেহই ইহার ব্যতিক্রম নহেন। সুবহানাল হাইয়িল্লাজি লা ইয়ামুতু ওয়ালা ইয়ামুত। তাঁহারই জন্য সমস্ত পবিত্রতা– যিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যু যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা।

তেইশে সফর তিনি তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ ফকিরদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। তাঁহাকে আজ অনেকটা সুস্থ দেখাইতেছে। রোগযন্ত্রণা অনেকটা কম মনে হইতেছে। মুরিদগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হুজুর রোগ মুক্তির কারণেই কি ফকিরদিগকে আপনার পোশাক পরিচ্ছদ দান করিলেন?

তিনি বলিলেন, 'না, পোশাকে আর প্রয়োজন নাই। মাশুক-মিলনের সময় যে আগত। প্রভুর দরবারে যে আমার ডাক পড়িয়াছে। সেই আনন্দেই এই সব বিতরণ করিলাম।'

জুমআর দিন আসিল। হজরত মোজাদ্দেদ র. জুমআর নামাজ আদায় করিবার জন্য জামে মসজিদে গমন করিলেন। উপস্থিত মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে অনেক উপদেশ

দান করিলেন। সুন্নতে নবী অনুসরণের প্রতিই নির্ভর করে সমস্ত সৌভাগ্য। মানব জীবনে এমন কোন সৌভাগ্য নাই– যাহার জন্য শরীয়ত ব্যতীত অন্যকিছুর প্রয়োজন হয়। ইহাই চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের মূল। দ্বীনের বিষয়ে সামান্য উদাসীনতাও বর্জনীয়। এইরূপ বিভিন্ন রকম অমূল্য নসিহতের পর তিনি বলিলেন, 'আমার তাজহীব ও তাকফীন (মাইয়েতের গোসল করান ইত্যাদি) যেন রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত মোতাবেক সম্পন্ন করা হয়। গোসলের সময় যেন আমার পুত্রগণ ও দুইজন খলিফা হাজির থাকেন।'

পুনরায় তিনি বলিলেন, 'এই ফকিরের বাসনা– তাহার কবর যেন পাকা না করা হয়। অল্পদিনের মধ্যে যেন কবরের চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যায়।

রোগযন্ত্রণা ক্রমাগত বাড়িতে লাগিল। সাতাশে সফর রাত্রিবেলা তিনি সকলের অনুরোধে উঠিয়া বসিলেন। মারেফাতের গুঢ় রহস্য বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, 'আমার হিম্মতের কপোত পাক দরবারে উপস্থিত হইলে আওয়াজ আসিল, হকীকতে কাবা ইহাই। পুনরায় উরুজ হইল। এইবার পৌঁছিলাম সেফাতে হাকিকিয়া পর্যন্ত যাহা অজুদে জাতে মওজুদ আছে। অতঃপর আমি শয়ুনাতে জাতী পর্যন্ত উপনীত হইলাম। তাহার পর সেখান হইতে জাতে বাহাত। ইহা সমস্ত নেসবত ও এতেবারাত হইতে মুক্ত। জিল্লিয়াতের (প্রতিবিম্বের) ধূলিকণা এ স্থানে পৌঁছে না।'

হজরত মোজাদ্দেদ র. দ্রুত দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। আটাশের রাত্রিতে তিনি অভ্যাস অনুযায়ী তাহাজ্জদের নামাজ পড়িবার জন্য উঠিলেন। অতি যত্নসহকারে অজু করিলেন। হৃদয়ের সমস্ত বিনয়, প্রেম ঢালিয়া দিয়া পরম প্রভুর দরবারে দণ্ডায়মান হইলেন। দীর্ঘ কেরআত পাঠ করিলেন। রুকু করিলেন। পরিপূর্ণ আনুগত্য সহকারে সেজদা করিলেন। নামাজ শেষ হইবার পর খাদেমগণকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আহা, আমার খেদমতের জন্য তোমরা কতইনা কষ্ট করিয়াছ। এইবার তোমাদের কষ্টের অবসান হইবে।'

রাত্রি শেষ হইল। সোবহে সাদেকের পবিত্র আভায় সমস্ত পৃথিবী ভরিয়া গেল। বোধ করি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মনে পড়িল, এমনি এক সময়ে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। কত স্মৃতিবিজড়িত জন্মভূমি এই সেরহিন্দে এমনি এক সোবহে সাদেক তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়াছিল।

মারহাবা মারহাবা ইয়া মোজাদ্দেদ,
খোশ আমদেদ, তোমায় জানাই খোশ আমদেদ।

মসজিদ হইতে আজান ধ্বনিত হইল– আল্লাহু আকবর-আল্লাহু আকবর। আল্লাহ্ মহান– আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি উঠিল– আল্লাহু আকবর। আল্লাহু আকবর আহ্! কি করুণ! কি হৃদয় বিদারক এই আজানের ধ্বনি। এ যেন প্রিয়া মিলনের আকুল আর্তি, ব্যাকুল আহ্বান।

হজরত মোজাদ্দেদ র. জামাতের সহিত ফজরের নামাজ আদায় করিলেন। তারপর কিছুক্ষণ মোরাকাবায় মশগুল রহিলেন। এশরাকের ওয়াক্ত হইল। পূর্ণ প্রেম ও আনুগত্যের সহিত তিনি এশরাক নামাজ আদায় করিলেন। নামাজ শেষে দোয়া মাছুরা পড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর বলিলেন, ‘ আমার এস্তেঞ্জার হাজত দেখা দিয়াছে। জলদি করিয়া বালি পূর্ণ একটি পাত্র আন।’

পাত্র আনা হইল। তিনি বলিলেন, ‘না– এখন আর এস্তেঞ্জা করিব না। এস্তেঞ্জা করিলে অজু করিতে হইবে। কিন্তু অত আর সময় নাই।’

অতঃপর তিনি উত্তর দিকে মস্তক রাখিয়া কেবলার দিকে মুখ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। ডান হাত গালের নিচে রাখিয়া জিকিরে মশগুল হইলেন। ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল। তাঁহার পুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘হুজুর! মেজাজ শরীফ কেমন আছে?’ তিনি বলিলেন, ‘ভাল। যে দুই রাকাত নামাজ আদায় করিলাম, তাহাই যথেষ্ট।’

পুনরায় তিনি আল্লাহ্পাকের স্মরণে বিভোর হইয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার পবিত্র রূহ রফিকে আলার সান্নিধ্যে চলিয়া গেল।

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

সব শেষ হইল। হাজার বৎসরের মোজাদ্দেদ, প্রিয় মোর্শেদ আর নাই। উপস্থিত সকলেই শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। প্রিয় মোর্শেদের বিয়োগ ব্যথায় সবারই নয়ন অশ্রুতে সিক্ত হইয়া উঠিল। চারদিকে শোকের মাতম উঠিল। আকাশ কাঁদিল, বাতাস কাঁদিল। মৌন প্রকৃতি, তরুলতা হাহাকার করিয়া উঠিল। আর তাহারা দেখিবেনা হাজার বছরের মোজাদ্দেদের পবিত্র বদন। এই মহামূল্যবান ফারুকী তলোয়ার মোজাদ্দেদী ছন্দে আর কোনদিন ঝলসিয়া উঠিবেনা এই সেরহিন্দের বুকে। সব শেষ হইল। সব শেষ হইয়া গেল।

পবিত্র শবদেহ গোসল দিবার বন্দোবস্ত হইল। দেখা গেল, তিনি নামাজে কেয়াম করিবার সময় যেভাবে দুই হাত নাভির নীচে বাঁধিতেন, সেইভাবে দুই হাত বাঁধিয়া আছেন। গোসল দিবার সময় হাত খুলিয়া দেওয়া হইল। প্রতিবার দুই হাত পুনঃ একত্রিত হইল এবং নাভির উপরে কেয়াম অবস্থার মত ডান হাত বাম হাতকে আপনা আপনি বাঁধিয়া ফেলিল। মুখে তাঁহার মৃদু হাসি। বেহেশতি নূর। সমস্ত

জীবন তিনি আল্লাহ্‌পাকের সন্তুষ্টি ছাড়া কোন কাজই করেন নাই– অন্তিমকালেও তাই তিনি দুই হাত বাঁধিয়া যেন জানাইয়া দিলেন, 'লাব্বায়েক-আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক– প্রভুহে, আমি হাজির-আমি হাজির।'

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দ্বিতীয় পুত্র জানাযার নামাজ পড়াইলেন। তারপর তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ পুত্র খাজা মোহাম্মদ সাদেক র. এর কবরের নিকটে লইয়া যাওয়া হইল। এই কবরের পাশে তাঁহাকে দাফন করিতে হইবে। জীবিতকালে তিনি একবার বলিয়াছিলেন, 'এই স্থানে আমার কলবের নূর ছড়াইয়া পড়িতেছে।'

এ নহে সেরহিন্দ বন্ধু, এ যে কোহেতুর–
প্রতি ধূলিকণা এর নূর, শুধু নূর।

খাজা মোহাম্মদ সাদেক র. এর কবরের পাশের স্থানটি ছিল সংকীর্ণ। সকলে ভাবিতে লাগিলেন– এই অপ্রশস্ত স্থানে কি করিয়া দাফন করা যাইবে। এমন সময় খাজা মোহাম্মদ সাদেক র. এর কবর আপনা-আপনি পূর্বদিকে প্রায় এক হাত সরিয়া গেল। পশ্চিম পাশের স্থান প্রশস্ত হইল। সেখানে পবিত্র কবর মোবারক খনন করা হইল। পুত্রগণ, মুরিদগণ, নয়নের নূর, প্রাণের সম্পদ প্রিয় মোর্শেদ কাইয়ুমে আউয়াল, ইমামে রব্বানী হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দি র.কে চিরতরে বিদায় দিলেন।

তারপর কতদিন গেল। কতদিন-কতমাস-কতবৎসর। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. নাই– কিন্তু তিনি যে হেদায়েতের নূরের সন্ধান মানুষকে দিয়া গিয়াছেন– পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ আজও সেই নূরের ছটায় সিরাত্বল মুস্তাকিমের পথ দেখিয়া লইতেছে। অগণিত ভক্ত ও অনুসারীদের হৃদয়ে এখনও তাঁহার স্মৃতি কুসুমের পর কুসুম ফোটাইতেছে। সেরহিন্দ। পবিত্র সেরহিন্দ। প্রাণের সেরহিন্দ। বাগে জান্নাত সেরহিন্দ। তুমিতো তাঁহার সুরত মোবারক বক্ষে ধারণ করিয়া আছ। আর আমরা তাঁহার প্রেম বুকে লইয়া আছি। বুক হইতে বুকে সেই প্রেম, সেই বেহেশতি নুর নূতন নূতন রূপে নূতন নূতন গন্ধে মুহুর্মুহু প্রস্ফুটিত হইতেছে।

কেয়ামত পর্যন্ত এই অনন্ত নূরের প্রস্রবণ– এই প্রেমের প্রস্ফুটনের গতি কখনও রুদ্ধ হইবে না। কখনই নিঃশেষ হইবে না।

আশেকজনের দিলে সেরহিন্দের স্মৃতি
এখনও ফোটায় ফুল বুক থেকে বুকে,
অনন্ত সে নূরের কভু হয়নাকো ইতি,
গোপন মিলন হয় আশেক মাশুকে।

বিরহী আশেক মোরা দূর দেশে থাকি,
সহায় সম্বল নাই-নাই কিছু নাই।
তোমারই রওজার পানে অশ্রুসিক্ত আঁখি,
শত সহস্র কোটি সালাম তোমাকে জানাই।

আরো কিছু কথা

কথার পরেও কথা থাকিয়া যায়। আল্লাহ্পাকের কথা– আল্লাহ্পাকের প্রিয় বান্দাগণের কথা শেষ হইয়াও শেষ হয় না। যেরূপ আল্লাহ্পাক রহস্যময়, তেমনি আল্লাহ্পাকের অলিগণও রহস্যময়। তাই তাঁহাদের সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিবরণ প্রদান করা দুরূহ ব্যাপার। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. তাঁহার মকতুবাত শরীফের প্রথম খণ্ডে ১৫৬ নং মকতুবে লিখিয়াছেন, 'জনৈক বুজর্গ ফরমাইয়াছেন, ইয়া আল্লাহ্ তুমি তোমার বন্ধুগণকে কি এমন মর্যাদা দান করিয়াছ যে, তাঁহাদের পরিচয় যাহারা জানিল তাহারা তোমাকেই পাইল এবং যে পর্যন্ত তোমাকে পাইবে না সে পর্যন্ত তাঁহাদের পরিচয়ও জানিতে পারিবে না।

সত্যিই আল্লাহ্পাকের অলিগণের সম্পর্কে যত কথাই বলা হোক না কেন তাহার পরেও কথা থাকিয়া যায়। বিশেষ করিয়া হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. সম্পর্কে একথা অধিক প্রযোজ্য।

কারণ বিগত যুগের উম্মতে মোহম্মদীর আউলিয়াগণকে পৃথক পৃথক ভাবে যে সমস্ত কামালত প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা সম্মিলিতভাবে তাঁহাকে প্রদান করা হইয়াছে এবং তাঁহার পরে একমাত্র ইমাম মেহেদী (আলায়হি রেদওয়ান) উক্ত মারেফাত সমূহের পূর্ণ অংশ পাইবেন।'

তিনি নিজেই বলিয়াছেন, “সুবহানাল্লাহ্! এই ফকির কর্তৃক যে সকল মারেফাত বা গুঢ় রহস্য প্রকাশিত হইতেছে, যদি অধিকাংশগণ সম্মিলিতভাবে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করে তবে পারিবে কিনা সন্দেহ। অবশ্য হজরত মেহেদী (আলাইহি রেদওয়ান) এই মারেফাতসমূহের পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হইবেন।”

হজরত মাযহার জানে জানান র. তাঁহার কেতাব ‘মলফূজাত’ এ উল্লেখ করিয়াছেন– এক সময় তিনি রসুলুল্লাহ্ স. এর দীদার হাসিল করিলেন। তিনি অনুভব করিলেন, তিনি রসুলে পাক স. এর এত কাছাকাছি যে, তাঁহার মোবারক নিঃশ্বাস নিজের শরীরে পড়িতেছে। কাছেই সেরহিন্দ শরীফের পীরজাদাগণও উপস্থিত আছেন। হঠাৎ তিনি তৃষ্ণার্ত হইলেন। তখন রসুলে পাক স. পীরজাদাগণের একজনকে পানি আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। হজরত জানে জানান র. তখন আরজ করিলেন ‘ইয়া রসুলুল্লহ! তাঁহারা যে আমার শ্রদ্ধেয় পীরের আওলাদ।’ রসুলে পাক স. এরশাদ করিলেন, ‘তাঁহারা আমার আদেশ পালন করেন।’ ইহা শুনিয়া পীরজাদাগণের একজন পানি লইয়া আসিলেন এবং তিনি উহা তৃপ্তি সহকারে পান করিলেন এবং আরজ করিলেন, ‘ইয়া রসুলুল্লহ্! হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. সম্পর্কে আপনার এরশাদ কি?’ রসুলে পাক স. বলিলেন, ‘আমার উম্মতের মধ্যে তাঁহার মত আর কে আছে।’

হজরত মীর্জা মাযহার জানে জানান র. আরও জানাইয়াছেন, যে সমস্ত জায়গায় হাবীবে পাক স. তাঁহার পবিত্র কদম রাখিয়াছেন, সে সমস্ত জায়গায় হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. তাঁহার মস্তক রাখিয়াছেন আর যে সমস্ত জায়গায় হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. তাঁহার কদম মোবারক রাখিয়াছেন– সে সমস্ত জায়গায় হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. তাঁহার মস্তক রাখিয়াছেন।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর খলিফা শায়েখ বদরুদ্দিন র. তাঁহার গ্রন্থ ‘হযরাতুল কুদস্ এ উল্লেখ করিয়াছেন, ‘একদিন হজরত খিজির আ. এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি বলিলাম, ‘হুজুর আমাকে আপনার নেসবতের ফয়েজ দিন। ‘ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি এমন এক ব্যক্তির নিকট হইতে নেসবত পাইয়াছ যাহা শুধু তোমার জন্য নয়– সমস্ত বিশ্বের জন্য যথেষ্ট।’

তাঁহার অন্যতম খলীফা মীর মোহাম্মদ নোমান র. জানাইয়াছেন, ‘একদিন, আমি হাবীবে পাক স. এর জেয়ারত হাসিল করিলাম। তাঁহার সহিত হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. ছিলেন। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া হাবীবে পাক স. বলিলেন, নোমানকে বলিয়া দাও, যে ব্যক্তি শায়েখ আহমদের নিকট মকবুল– সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌পাক ও আমার নিকট মকবুল। আর যে ব্যক্তি তাঁহার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়– সে আল্লাহ্‌তায়ালা ও আমার নিকটও গ্রহণযোগ্য নয়।’

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. নিজে জানাইয়াছেন, 'একদিন মোরাকাবার মধ্যে রসুলেপাক স. এর জেয়ারত নসিব হইল। হজরত শাফিউল মুজনেবিন স. এরশাদ করিলেন, আমি তোমাকে একটি এজাজতনামা লিখিয়া দিতে আসিয়াছি। আজ পর্যন্ত কাহাকেও এইরূপ এজাজতনামা লিখিয়া দেই নাই। হাবীবে পাক স. বলিলেন, তুমি যে ব্যক্তির জানাজার নামাজ পড়িবে, ঐ ব্যক্তিকে মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।'

হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁহার মাবদা ওয়া মাআদ কেতাবে লিখিয়াছেন, 'একদিন এই ফকির দোস্তগণের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন– এই ফকিরের দৃষ্টি তখন নিজের খারাবিগুলির প্রতি নিবদ্ধ ছিল। কিছুক্ষণ পরে মনে হইল যে, আমি ফকিরী-দরবেশীর সহিত পরিপূর্ণভাবে সম্পর্কচ্যুত। এমন সময় 'যে আল্লাহর ওয়াস্তে অবনত হয়, আল্লাহ্ তাহাকে উচ্চ করেন'– এই হাদিস শরীফ অনুযায়ী আল্লাহ্পাক আমাকে মাটি হইতে উত্তোলন করিলেন এবং আমি আমার কলবে শব্দ শুনিতে পাইলাম, 'গাফারতু লাকা ওয়ালিমান তাওয়াস্সালা বিকা বি ওয়াসিতাতীন আওবিগয়রি ওয়াসিতাতীন ইলা ইয়াওমিল কিয়ামাত' অর্থাৎ আপনাকে মাফ করিলাম এবং যে ব্যক্তি মধ্যস্থতায় অথবা বিনা মধ্যস্থতায় রোজ কেয়ামত পর্যন্ত আমার দিকে আপনাকে অসিলা গ্রহণ করিল, তাহাকেও মাফ করিয়া দিলাম। এই বাক্য পুনঃ পুনঃ আমার অন্তরে ধ্বনিত হইতে লাগিল। অবশেষে যখন এই ব্যাপারে কোনপ্রকার সন্দেহ অবশিষ্ট রহিল না– তখন উক্ত নেয়ামত প্রকাশ করিবার জন্য আদিষ্ট হইলাম।'

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর আবির্ভাবের পূর্বের অলিগণের উন্নতি বেলায়েত পর্যন্ত ছিল। হয়তবা তাঁহারা বেলায়েতের স্তরকেই পছন্দ করিতেন বেশী। হজরত রসূলে পাক স. এর মধ্যে যেমন নবুয়তের কামালাত ছিল তেমনি বেলায়েতের কামালাতও ছিল। হজরত মোজাদ্দেদ র. সর্বপ্রথম বেলায়েতের উপরে এবং নবুয়তের নিম্নে কাইয়ুমিয়াতের মাকামের বর্ণনা দেন এবং দাবী করেন যে, তাঁহার উন্নতি চার খলিফাগণের মত বেলায়েত হইতে নবুয়ত পর্যন্ত হইয়াছিল এবং বেলায়েতের উপরে কাইয়ুমিয়াতের স্তর তাঁহার জন্য খাস করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং তিনি উম্মতে মোহাম্মদীর প্রথম কাইয়ুম রূপে আখ্যায়িত হন। পরবর্তীকালে তাঁহার বংশেই আরও তিনজন কাইয়ুম আগমন করিয়াছেন। দ্বিতীয় কাইয়ুম ছিলেন তাঁহার সাহেবজাদা খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. তৃতীয় কাইয়ুম ছিলেন তাঁহার পুত্র খাজা মোহাম্মদ নকশবন্দ র. এবং চতুর্থ কাইয়ুম ছিলেন খাজা মোহাম্মদ জুবাইর র.। তিনি ছিলেন খাজা মোহাম্মদ নকশবন্দর. এর নাতি।

কাইয়ুম ঐ ব্যক্তিই হইতে পারেন, যাঁহার খামিরের সহিত হজরত রসূলে পাক স. এর খামিরের পরিত্যক্ত অংশ মিশ্রিত থাকে। মকতুবাত শরীফের তৃতীয় খণ্ডের ১০০ নং মকতুবে তিনি নিজেই ফরমাইয়াছেন, 'আমার খামির হজরত হাবীবে খোদা স.এর পরিত্যক্ত অংশ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।'

'রওজাতুল কাইয়ুমিয়া' গ্রন্থের লেখক খাজা মোহাম্মদ এহসান র. লিখিয়াছেন, 'দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে সহস্র বৎসরব্যাপী সূর্য কিরণ পতিত হইবার পর যে লাল পাথরের সৃষ্টি হয় তাহা সকলপ্রকার পাথর হইতে মূল্যবান হইয়া থাকে। হজরত মোজাদ্দেদ র. হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. এবং হজরত ওমর রা. এর মত দুই পর্বতের মাঝখানে অবস্থিত। তাঁহার তরিকতের নেসবত হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. এবং বংশের নেসবত হজরত ওমর ফারুক রা. এর সহিত যুক্ত। হজরত রসূলে করিম স.এর দ্বীন ইসলামের সূর্যের ফয়েজ সহস্র বৎসর ধরিয়া গ্রহণ করিবার পর হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

'ইমামে রব্বানী' ছিল হজরত মোজাদ্দেদ র. এর আর এক লকব। ইমামতের পদ নবুয়তের নূরের অংশ। ইমামের ফিতরত নবী আ.গণের ফিতরতের নিকটবর্তী। ইহা ছাড়াও তাঁহাকে 'খাজিনাতুর রহমত' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। অর্থাৎ তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌পাকের 'রহমত ভাণ্ডার।'

তিনি বিনা মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাকের সহিত কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার এলমে লাদুন্নি হাসিল ছিল। কোরআন শরীফের হরফে মোকাত্তায়াতের ভেদসমূহ তাঁহার নিকট প্রকাশ করা হয়। হজরত আলী রা. তাঁহাকে আসমানের এলেম শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং হজরত খিজির আ. ও হজরত ইলিয়াস আ. তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হায়াত ও মউতের গুপ্তরহস্য জানাইয়া দিয়াছিলেন। অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনাসমূহও তাঁহাকে জানানো হইয়াছিল।

হজরত মোজাদ্দেদ র. ছিলেন ছেলাহ্ বা সংযোগকারী। তিনি আল্লাহ্‌পাক ও বান্দাগণের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী সেতু। 'সাবাহাত ও মালাহাত' উভয় প্রকার সৌন্দর্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মাকামে 'খারেকীন ও আউয়ালিন' পর্যন্ত উপনীত হইয়াছিলেন। এই মাকাম 'আসহাবে ইয়ামিন' হইতেও অগ্রগামী। 'তাইয়ুনী হোব্বী ও অজুদী' এর মাকামগুলিও তাঁহার নিকট প্রকাশ করা হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ সাহাবা রা. গণের মত তিনিও হজরত রসূলে পাক স. এর অনুসরণের মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মতো এলমুল একিন ও হক্কুল একিনের জ্ঞানও লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ববর্তী অলিগণ হক্কুল একিন সম্পর্কে যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছিলেন– হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. সেগুলিকে এলমুল একিনের অংশ বলিয়াছেন। তাঁহাকে মাকামে মাহবুবিয়াতে জাতিয়ার খেরকাও প্রদান করা হয়।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর তরিকাই সর্বশ্রেষ্ঠ তরিকা। আখেরী জামানায় হজরত মেহেদি আলায়হি রেদওয়ান তাঁহারই তরিকার খলিফাগণের অন্তর্ভুক্ত হইবেন। তিনি ছিলেন একই সঙ্গে কুতুবে মাদার ও কুতুবে এরশাদ। পরবর্তীতে তাঁহারই সিলসিলায় কুতুবে মাদার ও কুতুবে এরশাদ হইবেন। কেয়ামত পর্যন্ত তাঁহার তরিকাভুক্ত মুরিদগণের পরিচয় তাঁহাকে জানান হইয়াছে।

তাঁহাকে দর্শনের জন্য সেরহিন্দে কাবা শরীফ আসিয়াছিল। তখন তাঁহার খানকা শরীফের কূপগুলি জমজমের পানিতে ভরিয়া গিয়াছিল। তাঁহার খানকা শরীফের জমিনকে বেহেশতী জমিনের মর্যাদা দেওয়া হইয়াছিল। মসজিদের উত্তর দিকে উক্ত পবিত্র জমিন অবস্থিত।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর রওজা মোবারক যেখানে অবস্থিত সেখানে মদীনা মনওয়ারার রসূলেপাক স. এর রওজা শরীফের কিছু মাটি আছে। এই মাটি হজরত নূহ আ.এর তুফানের সময় মদীনা মনওয়ারা হইতে এখানে আসিয়াছিল।

মোট কথা হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর কামালাত ও প্রকৃত মর্যাদার পরিপূর্ণ বর্ণনা দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ তাঁহার অধিকাংশ কামালত তিনি নিজেই গোপন রাখিয়াছেন।

যে সমস্ত মারেফাত ও গূঢ়রহস্যসমূহ তাঁহাকে জানানো হইয়াছিল তাহা চারি প্রকারের ছিল। প্রথম প্রকারের এলেম তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। দ্বিতীয় প্রকার মারেফাত শুধুমাত্র তাঁহার আওলাদগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৃতীয় প্রকারের মারেফত বর্ণনা করিয়াছিলেন তাঁহার খাস মুরিদানের নিকট এবং তাহাও করিয়াছিলেন অত্যন্ত গোপনীয়তা সহকারে। কেবল চতুর্থ প্রকারের মারেফত তিনি সাধারণভাবে সালেকগণের শিক্ষা-দীক্ষা এবং প্রার্থীগণের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন রেসালা ও পত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

হজরত মোজাদ্দেদ র. হানাফী ও শাফেয়ী মজহাব অনুযায়ী আমল করিতেন। কিন্তু হানাফী মজহাবকে অন্যান্য মজহাব অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিতেন। তিনি বলিয়াছেন, হানাফী মজহাবের নূরানিয়াত মহাসমুদ্রের মত এবং অন্যান্য মজহাবের নূরানিয়াত পুষ্করিণীর মত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কিছু কিছু বিষয়ে তাঁহার স্বতন্ত্র্য এজতেহাদ ছিল। কারণ হজরতে রসূলে পাক স. এর নিকট হইতে তিনি 'মুজতাহিদ' হইবার সুসংবাদ শ্রবণ করেন। মকতুবাত শরীফের ১ম খণ্ডের ২৫৯ নং মকতুবে তাঁহার একটি বিশিষ্ট মতসম্পন্ন মাসআলার উল্লেখ আছে।

যেমন– পর্বত গুহাবাসী কাফের যাহাদের নিকট নবী আ.গণের দাওয়াত পৌঁছে নাই, তাহাদিগকে ইমাম আবুল মনসুর মাতুরিদি র. দোজখী বলিয়াছেন। কারণ ইমাম আবু হানিফা র. এর মত– আল্লাহ্পাকের একত্ব প্রমাণের জন্য

মানুষের জ্ঞানই যথেষ্ট এবং শেরেকের গুনাহ্ আল্লাহ্পাক মাফ করিবেন না। সুতরাং পর্বতগুহাবাসীগণ নবী আ.গণের দাওয়াত না পাইলেও আল্লাহ্পাকের একত্ব প্রমাণের জন্য নিজেদের জ্ঞান ব্যবহার না করায় দোজখে যাইবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রা. আশায়ারী ইমামগণের মত অনুযায়ী ইহাদিগকে বেহেশতী বলিয়াছেন। কারণ, আল্লাহ্পাক বলিয়াছেন, 'আমি কাহাকেও শাস্তি দিব না, যে পর্যন্ত না তাহাদের নিকট রসূল প্রেরণ করি।' অতএব উক্ত কাফেরগণ বেহেশতী। কিন্তু এই বিষয়ে হজরত মোজাদ্দেদ র. মত প্রকাশ করিলেন যে, রসূল না প্রেরণ করিয়া শাস্তি প্রদান করার মত অবিচার আল্লাহ্পাক করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্পাকের সহিত শেরেক করিয়া কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়া বেহেশতে প্রবেশ করাও যুক্তিসংগত নয়। সুতরাং তাহারা বেহেশতে যাইবে না– দোজখেও যাইবে না। বরং আখেরাতে পুনরুত্থান ও বিচার করিবার পর আল্লাহ্পাক তাহাদিগকে গুনাহের পরিমাণে ভৎর্সনা ও শাস্তি দান করিবার পর গায়ের মোকাল্লাফ (শরীয়তের আওতা বহির্ভূত)-দের মত মাটিতে মিশাইয়া দিবেন– যেমন চতুষ্পদ জন্তু সমূহের অবস্থা হইবে। দারুল হরব বা কাফের রাজ্যের শিশুদের ব্যাপারেও তিনি একই মত পোষণ করেন।

হজরত মোজাদ্দেদ র. আরও বলেন যে, '....এই ফকির দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া তীক্ষ্ণভাবে যতই লক্ষ্য করিতেছে– দেখিতেছে যে, পয়গম্বর স. এর দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে নাই, এমন কোন স্থান পৃথিবীতে নাই। বরং স্পষ্টভাবে অনুভব করিতেছে যে, সূর্যরশ্মির মত তাঁহার দাওয়াতের নূর সর্বস্থানে পরিব্যাপ্ত। এমনকি সেকেন্দারী প্রাচীরের মধ্যবর্তী ইয়াজুজ মাজুজগণের নিকটেও এই দাওয়াত পৌঁছিয়াছে। পূর্ববর্তী উম্মাতগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে– পয়গম্বর প্রেরিত হয় নাই, এরূপ স্থান অতি অল্পসংখ্যক। হিন্দুস্তান– যাহা এই বিষয় হইতে দূরবর্তী বলিয়া মনে হয়– সেখানেও পয়গম্বর আ.গণ প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারাও হিন্দুস্তানীদেরকে সৃষ্টিকর্তার প্রতি আহবান জানাইয়াছিলেন। হিন্দুস্তানের কোন কোন শহরে শেরেকের ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও পয়গম্বর আ.গণের নূর সমুজ্জ্বল প্রদীপের মত দীপ্তমান বলিয়া অনুভূত হইতেছে। ইচ্ছা করিলে হিন্দুস্তানের সেই শহরগুলি আমি নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারি।'

সেরহিন্দ শরীফের পূর্ব দিকে হিন্দুস্তানী পয়গম্বর আ.গণের মাজার শরীফ রহিয়াছে। হজরত মোজাদ্দেদ র. কাশফ মারফত এই সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলেন। স্থানটির নাম 'বরছ'। সেরহিন্দ শরীফ হইতে এই স্থানের দূরত্ব আনুমানিক বিশ কিলোমিটার।

পয়গম্বর আ.গণের জীবনে অলৌকিক কার্য প্রকাশ হওয়া জরুরী। ইহা দ্বারা নবী ও গায়ের নবীর মধ্যে পার্থক্য করা যায়। তাঁহাদের দ্বারা প্রকাশিত অলৌকিক

কার্যকে 'মোজেজা' বলা হয়। অলি-আল্লাহ্‌গণের দ্বারা অলৌকিক কার্য প্রকাশ হওয়া জরুরী নয়। অর্থাৎ অলৌকিক কার্য প্রকাশিত হওয়ার উপরে বেলায়েত নির্ভর করেনা। তবুও প্রায়শঃই তাঁহাদের দ্বারা অলৌকিক কার্য সংঘটিত হয়। এই কার্যগুলিকে 'কারামত' বলা হয়।

নবী আ.-গণের মোজেজা দেখিয়া কাফেরগণ ভীত হয় এবং ঈমান আনে। তেমনি অলিগণের কারামত দেখিয়া ফাসেক ফাজেরগণ ভীত হইয়া তওবা করে এবং সৎপথে আগমন করে।

এইরূপ অলৌকিক কার্য কাফের ফাসেকদের দ্বারাও প্রকাশ লাভ করিতে পারে। তাহাদের অলৌকিক কার্যকে বলা হয় এস্তেদরাজ বা ভেলকিবাজি। মোট কথা, অত্যধিক কারামত হইবার উপর বেলায়েতের ক্ষেত্রে মর্তবা বৃদ্ধি হয় না। বরং অনেক সময় দেখা যায় যে, কম কারামতসম্পন্ন কোন বুজর্গের মর্তবা অধিক কারামতসম্পন্ন অলি হইতে বহু উচ্চে। তাহা ছাড়া ইহা সুস্পষ্ট যে, যিনি যতই উচ্চ মর্তবা সম্পন্ন অলিই হউন না কেন, কোন ক্রমেই তিনি হজরত রসূলে পাক স. এর সর্বনিম্ন মর্তবাধারী সাহাবা রা. এর মর্তবায় পৌঁছিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহাদের জীবনে অলিগণের তুলনায় অতি অল্পই কারামত প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই বিষয়ে হজরত মোজাদ্দেদ র. বলিয়াছেন, 'অলৌকিক বা স্বভাবের বিপরীত কার্যাবলী দুই রকমের। প্রথম প্রকার ঐ সমস্ত মারেফাত যাহা আল্লাহ্‌পাকের জাত, সেফাত ও আফয়াল এর সহিত সম্পর্কযুক্ত। ইহা চিন্তা ও জ্ঞানের ঊর্ধ্বে এবং প্রচলিত স্বভাব ও অভ্যাসের বিপরীত। আল্লাহ্‌পাকের বিশিষ্ট বান্দাগণই এই নেয়ামত অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেন। দ্বিতীয় ধরনের অলৌকিক কার্য হইল সৃষ্ট বস্তুসমূহের আকৃতির বিকাশ এবং অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ লাভ যাহা এই সৃষ্ট জগতের সহিত সম্পর্কিত। প্রথমটি আল্লাহ্‌পাকের পরিচয়প্রাপ্ত সত্যবাদিগণের জন্য বিশিষ্ট। দ্বিতীয়টির মধ্যে সত্যপন্থী, অসত্যপন্থী সবাই মিশ্রিত থাকে। কারণ সাধক কাফের ফাসেকগণও উহা পাইয়া থাকে। প্রথম অবস্থা আল্লাহ্‌পাকের নিকট সাদরে গ্রহণযোগ্য ও মূল্যবান। সেই কারণে তিনি শুধুমাত্র তাঁহার অলিগণকে উহা দান করেন এবং দুশমনদেরকে বঞ্চিত করেন। দ্বিতীয়টি লোক সমাজে মূল্যবান। কারণ কোন কাফের ফাসেকের দ্বারাও যদি উক্ত কার্য সমূহ প্রকাশিত হয়, তবুও লোকেরা উহাকেই পূজা করার জন্য প্রস্তুত হয় এবং ভালোমন্দ বিচার না করিয়াই তাহা আনুগত্য ও আগ্রহের সহিত পালন করার চেষ্টা করে। সাধারণ লোকে প্রথমটিকে কারামতই মনে করে না। বরং দ্বিতীয়টিই তাঁহাদের নিকট প্রকৃত কারামত। এই বঞ্চিত ব্যক্তিগণ সৃষ্ট পদার্থের আকৃতির বিকাশ ও অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ প্রাপ্তিকেই কাশফ ও কারামত ধারণা করে। ইহারা আশ্চর্য ধরনের নির্বোধ।'

কারামত অলিগণের জীবনে স্বাভাবিক ঘটনা। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর জীবনের প্রথম দিকে অসংখ্য কারামত প্রকাশ পাইয়াছিল। কোন কোন লেখক উহাদের সংখ্যা সাত শত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ্ কেহ্ কারামতের সংখ্যা আরও বেশী বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার একজন খাদেশ বর্ণনা করিয়াছেন, 'একসময় হজরত মোজাদ্দেদ র. তাওয়াজ্জোহ্ দান করিবার পর বলিলেন, আমি যদি এই তাওয়াজ্জোহ্ শুষ্ক কাঠের প্রতি নিক্ষেপ করি, তবে সঙ্গে সঙ্গে উহা সবুজ বর্ণ ধারণ করিবে। আর যদি ইহা দুনিয়াবাসীগণের প্রতি নিক্ষেপ করি তাহা হইলে তাহারা সকলেই নূরে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু কি করিব, উপায় নাই। আখেরী জামানা– ফেতনা ফাসাদময় এবং খায়েরবরকতশূন্য। এইরূপ নূর ও রহস্যসমূহ প্রকাশ করিবার অনুমতি নাই। তাই সাধারণভাবে আমি উহা প্রকাশ করিতে অক্ষম।'

অবশ্য এই তাওয়াজ্জোহ্ এখনও নকশবন্দিয়া (মোজাদ্দেদিয়া), বুজর্গগণের মধ্যে বিদ্যমান আছে। এই তাওয়াজ্জোহ্ এর সাহায্যে তাঁহারা মানুষের মৃত কলবে (অন্তঃকরণে) জীবন দান করেন।

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সুমহান কারামতগুলির মধ্যে একটি হইল মানুষের কলবে জীবন দান করিয়া তাহাতে স্থায়ীভাবে বক্ষসম্প্রসারণের ফয়েজ জারী রাখা। যেমন হজরত ঈসা আ. এর মৃতকে জীবন দান, হজরত মুসা আ.এর হাতের তালূ জ্যোতির্ময় হওয়া, হজরত দাউদ আ. এর হাতে লোহা মোমের মত গলিয়া যাওয়া, হজরত সালেহ্ আ. এর উষ্ট্রির কথোপকথন এবং হজরত সোলায়মান আ.এর সুবিশাল বাদশাহী অপেক্ষা রহমাতুল্লিল আলামিন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর কলবে যে ফয়েজ ও শান্তি প্রবাহ জারী ছিল তাহা বহুগুণে মহান ও শ্রেষ্ঠ।

তাঁহার সাহেবজাদা খাজা মোহাম্মদ সাদেক র. মুসাবিউল মাশরব ছিলেন। তিনি তাঁহার বাতেনী শক্তির প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহাকে মোহাম্মদীউল মাশরব বানাইয়া দেন।

একদিন তিনি তাঁহার একজন মুরিদকে বলিলেন, 'তুমি বেলায়েতে ইব্রাহীমি পাইয়াছ।' কিন্তু সে এই কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না। রাত্রিবেলা স্বপ্নযোগে হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁহার সহিত হজরত ইব্রাহিম আ.এর সাক্ষাত করাইয়া দিয়া উক্ত কথার সত্যতা প্রমাণিত করিয়া দিলেন। সকালে সেই মুরিদ তাঁহার নিকট আসিয়া স্বপ্নের কথা বর্ণনা করিলেন এবং তাঁহার পবিত্র কদমে পড়িয়া মাফ চাহিলেন।

হজরতের ফয়েজে অনেক কবরবাসীও অলি-আল্লাহ্ হইয়া গিয়াছিলেন। এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে অছিয়ত করিয়াছিলেন যে-'আমার জানাজা যেন হজরত

মোজাদ্দেদ র. এর খেদমতে লইয়া যাওয়া হয়।' মৃত্যুর পরে তাঁহার জানাজা যথারীতি হজরতের খেদমতে লইয়া যাওয়া হইল। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁহার প্রতি তাওয়াজ্জোহ্ প্রদান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই মৃত ব্যক্তির কলব জারী হইয়া গেল। সেই রাত্রে তাঁহার আত্মীয় স্বজন স্বপ্নে তাঁহার প্রকৃত অবস্থা দর্শন করিলেন।

একদা তিনি শায়েখ লাহোরীর কপালে 'আল কাফের' লেখা রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। কয়েকদিন পর সংবাদ পাওয়া গেল, শায়েখ লাহোরী কাফের হইয়া পৈতা ধারণ করিয়াছেন। তখন হজরত মোজাদ্দেদ র. 'লওহে মাহফুজ' এর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সেখানেও 'আল কাফের' লেখা দেখিতে পাইলেন। অতঃপর হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁহার জন্য দোয়া করিলেন। দোয়া কবুল হইল। শায়েখ লাহোরী কয়েকদিন পর তাঁহার নিকট আসিয়া বায়াত গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি খেলাফতও লাভ করিয়াছিলেন।

হজরত মোজাদ্দেদ র. কাদেরিয়া তরিকার তালিমও দিতেন। তাঁহার মাধ্যমে চলিয়া আসা কাদেরিয়া সিলসিলার নাম 'কাদেরিয়া মোজাদ্দেদিয়া।' তাঁহার কাদেরিয়া তরিকার একজন মুরিদ পীরে দস্তগীর গাউসুল আজম র. এর জেয়ারত লাভের জন্য অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তিনি উক্ত মুরিদকে 'কুতুব তারকার' প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলিলেন। এমন সময় উক্ত তারকা হইতে গাউসে আজম র. তীর বেগে বাহির হইয়া আসিয়া সামনে দাঁড়াইলেন। মুরিদ তাঁহাকে ভালভাবে দেখিবার পর তিনি পুনরায় সেই তারকার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

একজন দরবেশ একবার হজরতের খেদমতে আসিয়া আরজ করিলেন, 'এই বৎসর আমি হজে যাইব বলিয়া খাঁটি এরাদা করিয়াছি' হজরত মোজাদ্দেদ র. কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'আরাফাতের মাঠে তো তোমাকে দেখিতেছি না।' হজরতের কথাই ঠিক হইল। সেই দরবেশ শুধু সেই বৎসরেই নয়– পর পর কয়েক বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিলেন– কিন্তু হজে যাইতে পারিলেন না।

শায়েখ মাহমুদ নামে হজরতের এক ভাই ছিলেন। একবার তিনি এক কাফেলার সহিত কান্দাহার গিয়াছিলেন। একদিন হজরত বলিলেন, 'আজ আমি শায়েখ মাহমুদের অনেক অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু পাইলাম না। বরং কান্দাহারে তাঁহার কবর দেখিলাম।' উক্ত কাফেলা বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিলে জানা গেল– হজরত মোজাদ্দেদ র. ঠিকই বলিয়াছেন।

একবার গ্রীষ্মকালে হজরত সফরে বাহির হইয়াছিলেন। পথে অত্যন্ত গরম পড়িল। খাদেমগণ বৃষ্টির পানির জন্য তাঁহার নিকট আরজ করিলেন। তিনি দোয়া করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আকাশে মেঘ দেখা দিল এবং বর্ষণ শুরু হইল।

শেষ জীবনে তিনি আজমীর শরীফে খাজা গরীবে নেওয়াজ র. এর দরবারে গিয়াছিলেন। মসজিদের ভিতরে তারাবী নামাজে আগত মুসল্লিদের স্থান সংকুলান হইত না। বাহিরেও ছিল বৃষ্টি। তখন ছিল বর্ষাকাল। হজরত মোজাদ্দেদ র. দোয়া করিলেন। ইহার পর কোরআন শরীফ খতম না হওয়া পর্যন্ত আর বৃষ্টি হইল না।

'হজরত রসুলেপাক স. এর দরবারে সাহাবা রা.গণ এক মুহূর্তে কামেল হইয়া যাইতেন। অথচ আজকাল বহু পরিশ্রম করিয়াও কিছু লাভ হয় না।' এইরূপ আফসোস করিয়া এক ব্যক্তি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর নিকট পত্র লিখিলেন। উত্তরে তিনি জানাইলেন, এইরূপ কামালাত হাসিলের জন্য সংসর্গ লাভের প্রয়োজন। পরে যখন সেই ব্যক্তি হজরতের খেদমতে হাজির হইলেন– তখন প্রথম দর্শনেই বাতেনী কামালাতে ভরপুর হইয়া গেলেন।

হজরতের হালকায় একজন হাফেজ সাহেব কোরআন শরীফ পাঠ করিতেন। হঠাৎ তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. শুধু বলিলেন, 'হাফেজ সাহেবকে আমার জিম্মায় লইলাম।' এই কথা বলা মাত্রই হাফেজ সাহেব সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

একজন তালেবে মাওলার অন্তরে হজরত আলী রা. এর সহিত বিবাদ বিসম্বাদের কারণে হজরত মাবিয়া রা. এর প্রতি ঘৃণা বোধ ছিল। তিনি মকতুবাত শরীফ পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, 'মহান সাহাবা রা.গণের প্রতি ইনকারকারীগণ একই প্রকার শাস্তি পাইবার যোগ্য– তাহা হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. এর প্রতিই করা হোক– কিংবা হজরত মাবিয়া রা. এর প্রতিই করা হোক! হজরত ইমাম মালেক র. এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন।' সেই ব্যক্তি এই মতের প্রতি আস্থা আনিতে পারিলেন না। তিনি রাত্রিবেলা স্বপ্নে দেখিলেন যে, হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁহাকে আমিরুল মোমেনীন হজরত আলী রা. এর নিকট লইয়া গেলেন। হজরত আলী রা. উক্ত ব্যক্তিকে বলিলেন– 'সাবধান! এই মকতুবের প্রতি কোনপ্রকার সন্দেহ করিও না। যে সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহ আমাদের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল অন্য কাহারও পক্ষে তাহার গূঢ় রহস্য জানা সম্ভব নয়।'

হজরত একবার এক আমিরের বাড়ী গেলেন। ইহাতে এক মুরিদের মনে তাঁহার প্রতি খারাপ ধারণার সৃষ্টি হইল। তখন গায়েবীভাবে কে যেন তাঁহাকে বলিল, 'হুশিয়ার হও। অলিআল্লাহ্গণের প্রতি খারাপ ধারণা রাখার ফল বড়ই মারাত্মক। যদি বাঁচিতে চাও তবে তওবা কর।'

হজরতের মুরিদগণের মধ্যে কেহ রোগগ্রস্ত হইলে হজরতের শুভ দৃষ্টির প্রভাবেই তাঁহারা আরোগ্য লাভ করিতেন। এক সময় এক ব্যক্তি নিজের বাড়িতেই অসুস্থ হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। সকালে হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁহার

প্রতি গায়েবানা দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন হইতে তাঁহার রোগ ভাল হইতে শুরু করিল এবং অল্পক্ষণ পরেই তিনি পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেলেন।

একদিন এক ব্যক্তি হজরতের খেদমতে কিছু উপহার সামগ্রী রাখিয়া এক পীড়িত লোকের রোগমুক্তির জন্য দোয়া চাহিলেন। হজরত অল্প কিছুক্ষণ মোরাকাবা করিলেন এবং উপহার গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, 'আমি তাহার গোনাহ্ মাফের জন্য দোয়া করিতেছি।' পরে জানা গেল ঐ ব্যক্তি তখন আর জীবিত ছিল না।

হজরতের একজন মুরিদ এক শহরে কাফেরদের সহিত সংঘর্ষের সময় পরাজয় বরণ করিবার উপক্রম হইলেন। তখন উক্ত মুরিদ হজরতকে স্মরণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হজরত সেখানে গিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিলেন। ফলে তিনি জয়লাভ করিলেন।

খাজা জামালুদ্দিন নামক এক ব্যক্তি হজরতের নিকট উপকার লাভের জন্য আসিয়াছিলেন। হজরত তাঁহাকে বলিলেন, 'তোমার অন্তরে নারীদের প্রতি আকর্ষণ প্রবল। উক্ত আকর্ষণ হইতে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তুমি কিছুই লাভ করিতে পারিবে না।' তিনি এই কথা স্বীকার করিলেন এবং তওবা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বরকত প্রকাশিত হইতে শুরু করিল।

এমনিভাবে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর জীবনে বহু কারামত প্রকাশ পাইয়াছিল। সে সবের প্রকৃত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। আর তাহা ছাড়া তিনি নিজেই এই ধরনের কারামতকে তেমন মূল্য দিতেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মূল কারামত ছিল দ্বীনের সংস্কার করা। তাঁহার প্রধান পরিচয়, তিনি ছিলেন মোজাদ্দেদ এবং হাজার বৎসরের মোজাদ্দেদ।

'মোজাদ্দেদ' পদ কোন সাধনালব্ধ জিনিস নহে। 'নবুয়ত' যেমন আল্লাহ্পাকের খাছ দান, মোজাদ্দেদিয়াত তেমনি। কারণ, এমন কোনই সাধনা নাই যাহা দ্বারা এই নেয়ামতসমূহ লাভ করা যায়। নবীগণকে যেমন আল্লাহ্পাক প্রেরণ করেন, তেমনি মোজাদ্দেদকেও প্রেরণ করেন। পার্থক্য শুধু মাত্র এই যে, নবুয়ত মূল এবং মোজাদ্দেদিয়াত তাহার ছায়া।

হজরত শায়েখ আহমদ র. যখন মোজাদ্দেদ হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন- তখন হিন্দুস্তান আলেম এবং মাশায়েখ শূন্য ছিল তাহাও নহে। সংখ্যায়ও তাঁহারা অল্পসংখ্যক ছিলেন না। হজরত বাকী বিল্লাহ্ র. এর মত বিখ্যাত নকশবন্দী বুজর্গ দিল্লী শহরেই বসবাস করিতেন। শাহ সেকান্দার কাদেরী র. ছিলেন কাদেরিয়া তরিকার বিখ্যাত বুজর্গ। তাঁহার সম্পর্কে হজরত মোজাদ্দেদ র. বলিয়াছেন, 'তাঁহার অন্তরের নূরের তেজ এত প্রখর যে, সেদিকে দৃষ্টিপাতই করা যায় না।'

শাহ ফজলুর রহমান বোরহানপুরী র. শায়েখ ঈসা বোরহানপুরী র., শায়েখ নিজাম নারনবী র. শায়েখ নিজামউদ্দিন থানেশ্বরী র., শাহ কাসিম সোলায়মানি র.,

খাজা খাওন্দ মাহমুদ লাহোরী র., শাহ ফতহুল্লাহ র. প্রভৃতি বুজর্গগণ নিজ নিজ বিষয়ে ইমাম সদৃশ্য ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই ছিলেন খ্যাতনামা অলি। বহু কারামত ও জজবাধারী এই সব অলিগণের কাহারো কাহারো প্রশংসা হজরত মোজাদ্দেদ র. স্বয়ং করিয়া গিয়াছেনঃ

তাহা ছাড়া সৈয়দ মীর শাহ বলখী র. এবং মীর মোমেন বলখী র. বলখ ও খোরাসানের বিখ্যাত মাশায়েখগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁহারা গায়েবানা হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মুরিদ হইয়াছিলেন।

আলেমগণের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন হজরত শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলবী র., মাওলানা আবদুল হাকিম শিয়ালকোটি র., মাওলানা জামালুদ্দিন লাহোরী তিলবি র., মাওলানা হাসান কাবাদানী র., মাওলানা নাওলাক র. প্রভৃতি।

শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলবী র. ছিলেন খ্যাতনামা আলেম। প্রথম দিকে তিনি হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর প্রতি অন্তরে হিংসা পোষণ করিতেন। হাসান খান কাবুলীর ফেতনাই ছিল ইহার মূল কারণ।

হাসান খান কাবুলী হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মুরিদ ছিল। পরে হজরতের এক খলিফার সঙ্গে তাহার মনোমালিন্য হয় এবং শেষে সে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। সে অনেক মকতুবকে বিকৃত করিয়া তাহার সহিত কুফরী ও জিন্দিকিয়াতের মন্তব্য সংযোজিত করিয়া হিন্দুস্তান ও আফগানিস্তানের খ্যাতনামা আলেমগণের নিকট উহার অনুলিপি পাঠাইয়া দেয়। ফলে বিভিন্ন আলেম হজরতের বিরোধিতা শুরু করেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. আসল ঘটনা জানিতে পারিয়া হাসান খান কাবুলীর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। পরে সে হজরতের বদদোয়ার ফলে বোখারা শহরে মুরতাদ হইবার অভিযোগে নিহত হয়।

শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলবী র. এর বিরোধিতা ছিল সর্বাধিক জোরদার। পরে যখন হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁহার নিকট বিকৃত মকতুব সমূহের আসল অনুলিপি পাঠাইয়া দেন, তখন তিনি শান্ত হন এবং বিরোধিতা পরিত্যাগ করেন। অতঃপর একদিন তিনি হজরত রসূলে পাক স. এর জেয়ারত হাসেল করেন। তিনি দেখেন, রসূলে পাক স. হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রতি ইশারা করিয়া ফরমাইতেছেন, 'যে আমাকে ভালবাসিতে চায়– ইহার সহিতও তাহার ভালবাসা হওয়া উচিত।'

এই ঘটনার পর হজরত দেহলবী র. এর অন্তরে পরিপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। তিনি তখন হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. এর খলিফা হজরত খাজা হুছামুদ্দিন র. এর নিকট লিখিত এক পত্রে বর্ণনা করেন, 'মিয়া শায়েখ আহমদ সাল্লামাহুর সঙ্গে আমার আত্মিক সাফাই ও বিশুদ্ধ মহব্বত সম্প্রতি অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। জানিনা ইহার রহস্য কি? এখন মানবীয় গুণাবলী (হিংসা বিদ্বেষ প্রভৃতি) কোন বাধা

সৃষ্টি করিতেছেনা। এইরূপ একজন বুজর্গ ও বন্ধুর প্রতি খারাপ ধারণা রাখা অনুচিত, জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতা এই কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। আমি অসাধারণ যওক, অনুভূতি ও গালবার মধ্যে নিমজ্জিত আছি– যাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য আমার নাই। আল্লাহ্ই অন্তর ও অবস্থার পরিবর্তনকারী। আত্মিক দর্শনধারী ব্যক্তিগণ ইহাতে বিস্মিত হইবে। কিন্তু আমার প্রতি কি প্রকারের কাইফিয়ত হইতেছে তাহা সম্পর্কে আমার জ্ঞান নাই। কিভাবেই বা আমি উহা প্রকাশ করিব?'

ইহার পরে তিনি তাঁহার পুত্রকে এক চিঠিতে নির্দেশ দিলেন, 'মিয়া শায়েখ আহমদ সাল্লামাহুর মন্তব্যের উপর আমি যে সমস্ত অন্যায় উক্তি সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহা পানি দিয়া ধুইয়া ফেল এবং তাহার সম্পর্কে অন্তরে কোন প্রকার খারাপ ধারণার উদ্রেক হইয়া থাকিলে তাহা দূর করিয়া দাও।'

মাওলানা আবদুল হাকিম শিয়ালকোটি র. ও হজরত মোজাদ্দেদ র. এর বিরোধী ছিলেন। একবার তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন 'বল আল্লাহ্ এবং তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর।' ইহা শুনিয়াই তাঁহার হৃদয়ে আল্লাহ্পাকের মহব্বত সৃষ্টি হইল এবং তৎক্ষণাৎ কলব জারী হইল। পরে তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর নিকট গিয়া মুরিদ হইলেন এবং কামালিয়ত হাসিল করিলেন। হিন্দুস্তানের আলেমগণের মধ্যে তিনিই প্রথম হজরত মোজাদ্দেদ র.কে 'মোজাদ্দেদে আলফে সানি' উপাধিতে ভূষিত করেন।

মাওলানা জামালুদ্দিন লাহোরী তিলবী র. 'তৌহিদে অজুদি' সম্পর্কে বাহাছ করিতে গিয়া হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মুরিদ হন। ইহা ছাড়া মাওলানা হাসান কাবাদানী র. এবং মা অরা উন্নাহারের বিখ্যাত আলেম মাওলানা নওলাক র. গায়েবানা হজরত মোজাদ্দেদ র. এর নিকট মুরিদ হইয়াছিলেন।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তৎকালীন অনেক খ্যাতনামা আলেম মওজুদ থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় সহস্রাব্দের দ্বীন সংস্কারের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল হজরত মোজাদ্দেদ র. এর উপর এবং শুধু তিনিই এককভাবে এই গুরু দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে এইরূপ মহা শানদার মোজাদ্দেদ এক জনই হইয়া থাকেন। একাধিক ব্যক্তির উপর কখনও এই মহান দায়িত্ব অর্পিত হয় না। এই কথা হজরত মোজাদ্দেদ র. নিজেই মকতুবাত শরীফে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রত্যেক শতকের প্রারম্ভে একজন অথবা কোন কোন সময় একাধিক মোজাদ্দেদের আবির্ভাব হয়। শতকের মোজাদ্দেদ এবং সহস্রের মোজাদ্দেদের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। শতক ও সহস্রের পার্থক্য যেরূপ, উভয়প্রকার মোজাদ্দেদের মর্তবার পার্থক্যও তদ্রুপ। বরং তাহা অপেক্ষাও বেশী। ঐ ব্যক্তিকেই মোজাদ্দেদ বলা যায়, যাঁহার মাধ্যমে সেই

যুগের সমস্ত উম্মত ফয়েজ ও নূর পাইয়া থাকেন। কুতুব, আওতাদ, আবদাল, নজিব যেই হননা কেন, মোজাদ্দেদের মাধ্যম ব্যতীত কেহই ফয়েজ ও নূর পান না।

হজরত মোজাদ্দেদ র. ছিলেন হানাফি মাতুরিদি আলেমগণের মতানুসারী। তিনি এরশাদ করিতেন, উক্ত আলেমগণ কর্তৃক উদ্ধারকৃত আকিদা বিশ্বাস বিশুদ্ধ কাশ্‌ফ কর্তৃক প্রমাণিত। ইহাতে অন্যান্য মতবাদের মত দর্শনের প্রভাব নাই। মাশায়েখগণের কাশ্‌ফ ইহার বিপরীত হইলে অবশ্যই তাহা পরিত্যাজ্য। তিনি বলিয়াছেন,

'.....জানা আবশ্যক যে, কোন মাসআলার সম্পর্কে আলেমগণ ও সূফীগণ এর মধ্যে যখন মতবিরোধ প্রকাশ পায় তখন আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে আলেমগণের মতই সঠিক বলিয়া দেখিতে পাই। ইহার কারণ এই যে, পয়গম্বর আ.গণের অনুসরণ করিয়া আলেমগণ কামালাতে নবুয়ত ও তাহার এলেম পর্যন্ত পৌঁছিয়াছেন; পক্ষান্তরে সূফীগণের দৃষ্টি কামালাতে বেলায়েত এর প্রতি নিবদ্ধ ও তাহার মারেফাতের উর্দ্ধে পৌঁছে না। অতএব যে জ্ঞান 'নবুয়তের তাক' হইতে আগত তাহা, বেলায়েত হইতে আগত জ্ঞান হইতে অধিক সত্য ও সঠিক।'

সুন্নত জামাত মতাবলম্বীগণই যে একমাত্র উদ্ধারকৃত দল, একথা তিনি মকতুবাত শরীফে বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিতেন, প্রথম ফরজ হইল সুন্নত জামাতের আলেমগণ কর্তৃক উদ্ধারকৃত আকিদা অনুযায়ী নিজের আকিদা বিশুদ্ধ করা।

হজরত মোজাদ্দেদ র. কোরআন হাদিস শিক্ষাকে তরিকত শিক্ষা অপেক্ষা বেশী গুরুত্ব দিতেন এবং নবুয়তকে বেলায়েত হইতে শ্রেষ্ঠ বলিতেন। বিশেষ মানুষকে বিশেষ ফেরেশতা অপেক্ষা অধিক মর্তবাধারী বলিতেন। যেমন তিনি বলিয়াছেন, 'এই ফকির যাহা জানিতে পারিয়াছে তাহা এই যে, ফেরেশতাগণের বেলায়েত বা নৈকট্য পয়গম্বর আ.গণের বেলায়েত হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু নবুয়ত ও রেসালত এর মধ্যে নবী আ.গণ এমন এক ধরনের বৈশিষ্ট্য রাখেন, যেখানে কোন ফেরেশতা প্রবেশ করিতে পারেন না এবং উক্ত বৈশিষ্ট মৃত্তিকার মধ্যে নিহিত যাহা শুধুমাত্র মানুষের মধ্যেই আছে। এই ফকির আরও জানিতে পারিয়াছে যে, কামালাতে নবুয়তের তুলনায় কামালাতে বেলায়েতের কোন মূল্য নাই। আফসোস! যদি মহা-সমুদ্রের তুলনায় এক বিন্দু পানির সমতুল্যও হইত। অতএব নবুয়ত হইতে প্রাপ্ত উৎকর্ষ, বেলায়েত হইতে অর্জিত উৎকর্ষ হইতে বহুগুণ শ্রেষ্ঠ।'

হজরত মোজাদ্দেদ র. হানাফি মজহাবকে অন্যান্য মজহাব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জানিতেন। নক্‌শবন্দিয়া তরিকাকে অন্যান্য তরিকা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিতেন। তিনি

বলিতেন, এই তরিকা সুন্নত ও মহান সাহাবা রা. গণের অনুসরণের কারণে তাঁহাদেরই তরিকার অনুরূপ।

তিনি বলিয়াছেন, 'নক্‌শবন্দিয়া তরিকায় প্রথম অবস্থাতেই শেষ বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাকে তাঁহারা 'ইনদেরাজুন্নেহায়াত ফিল বেদায়াত'নামে অভিহিত করেন। হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ কু. বলিয়াছেন, 'আমরা শেষ বস্তুকে প্রথমে প্রবেশ করাইয়া থাকি।' এই তরিকা অবিকল সাহাবা রা.গণের তরিকা। তাঁহারা হজরত নবীয়ে পাক স. এর প্রথম সংসর্গে যাহা হাসিল করিয়াছিলেন, অলি আল্লাহ্‌গণ শেষ স্তরে যাইয়া হয়তো তাহার কিছু অংশ হাসিল করেন। এই কারণেই অহশী রা. নামক সাহাবী যিনি হজরত হামজা রা.কে শহীদ করিয়াছিলেন, তিনিও শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী হজরত ওয়ায়েছ করণী র. হইতে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। হজরত রসূলে পাক স. এর প্রথম দর্শনেই তিনি যাহা পাইয়াছিলেন, হজরত ওয়ায়েছ করণী র. শেষ মাকামে যাইয়াও তাহা পান নাই। অতএব সাহাবী রা.গণের যুগই শ্রেষ্ঠ যুগ। হাদিস শরীফে উল্লিখিত 'তৎপর' শব্দটি যেন সবাইকে দূরবর্তী করিয়া পিছনে সরাইয়া দিয়াছে।

এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মোবারক কু.-কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, হজরত মাবিয়া রা. এবং ওমর ইবনে আবদুল আজিজ র. এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, হজরত রসুলে পাক স. এর অনুসরণের সময় হজরত মাবিয়া রা. এর ঘোড়ার নাকের ভিতরে যে ধূলিকণা জমিয়াছিল, তাহার শ্রেষ্ঠত্বও হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ র. হইতে বহুগুণ বেশী। সুতরাং বিশদভাবে প্রমাণিত হইল যে, নক্‌শবন্দিয়া বুজর্গগণের সিলসিলা মুক্তা সদৃশ এবং অন্য জামানার তুলনায় এই তরিকার শ্রেষ্ঠত্বও তদ্রুপ।'

এইরূপ মকতুবাত শরীফের বহুস্থানে হজরত মোজাদ্দেদ র. নক্‌শবন্দিয়া তরিকার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি প্রায় সময়ই শায়েখ আকবর র. এর গুণাবলী বর্ণনা করিতেন। কিন্তু তাহার শরীয়তবিরোধী কাশফের প্রতিবাদও করিতেন। তিনি তৌহিদে অজুদিকে প্রকাশ্যভাবে বর্ণনা করা নাজায়েজ বলিয়া মন্তব্য করিতেন এবং তৌহিদে অজুদির অনুসরণ করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য লোকজনকে সতর্ক করিয়া দিতেন এবং সুস্থতাকে মত্ততার উপরে স্থান দিতেন।

উচ্চস্বরে জিকির করাকে তিনি বেআদবী ধারণা করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, '-ইহাদের মধ্যে অনেকেই উক্ত নেয়ামত না পাইয়া মনি-মুক্তার পরিবর্তে ভাঙ্গা মাটির হাড়ির টুকরা লইয়া তৃপ্ত আছেন– শিশুগণ যেরূপ আখরোট মোনাক্কা পাইয়া সন্তুষ্ট হয়। অস্থির হইয়া অনেকে পূর্ববর্তী বুজর্গগণের পথ হইতে সরিয়া গিয়া জিকিরে জহর বা উচ্চস্বরে জিকির করিয়া শান্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

হজরত মোজাদ্দেদ র. সংসারী অলিগণকে নির্জনবাসী অলিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিতেন। নির্জনবাস অবলম্বনকে তিনি অনর্থক ধারণা করিতেন এবং উহা দ্বারা সুন্নতের বিরোধিতা করা হয় বলিয়া মত প্রকাশ করিতেন। কবর, সেজদা, সুমধুর স্বরে কবিতা পাঠ, লম্ফ ঝম্ফ প্রভৃতি ছিল তাঁহার দৃষ্টিতে নাজায়েজ। কিন্তু কবর জেয়ারত, অলি আল্লাহ্গণের নিকট সাহায্য চাওয়া এবং আর্থিক ও দৈহিক ইসালে সওয়াবকে জায়েজ বলিতেন। আবার কবর চুম্বন করাকে মকরূহ বলিতেন।

প্রথম দিকে তিনি তাহার বুজর্গ আব্বাজানের মাজার স্পর্শ করিতেন এবং নিজের মোবারক মুখে মুছিতেন। পরে তিনি উহা পরিত্যাগ করেন। ফকিহ্গণ যে মতের উপর একমত হইতেন– সেই অনুযায়ীই তিনি আমল করিতেন। যেমন তিনি এই উদ্দেশ্যেই ইমামতি করিতেন যে, ইমামতি করিলে সূরা ফাতেহা পড়িবার সুযোগ পাওয়া যায়। ইমাম আবু হানিফা র. এর মতে কবরের পাশে বসিয়া কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা মকরূহ। আবার ইমাম মোহাম্মদ র. এর নিকট উহা জায়েজ। তাই তিনি কখনও কবরের পাশে বসিয়া কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেন– কখনও করিতেন না।

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর চরিত্র ছিল শিশু সুলভ সরলতায় ভরা। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান, তেজস্বী, দাতা, চিন্তাশীল, বিনয়ী, সহিষ্ণু ও নির্লোভ। তিনি জীবিকার জন্য বিন্দু পরিমাণও চিন্তিত হইতেন না। জাহাঙ্গীরের মত প্রতাপশালী ও সম্পদশালী বাদশাহ্ তাঁহার মুরিদ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁহার নিকট হইতে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য ও ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেন নাই।

প্রতিদিন প্রায় একশত মেহমান তাঁহার খানকায় আহার করিতেন। ইহারা সকলেই ছিলেন হাফেজ, আলেম ও নেককার ব্যক্তি। রমজান মাসে মেহমানের সংখ্যা আরও বাড়িয়া যাইত। হজরতের বাড়ীর খানা ছিল বড়ই সুস্বাদু। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর একবার তাঁহার বাড়ীতে পানাহার করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি এই রকম সুস্বাদু খানা জীবনে কখনও খাই নাই।'

হজরত মোজাদ্দেদ র. পূর্ণরূপে সুন্নতের পায়রবী করিতেন। অতি সামান্য বিষয়েও তিনি সুন্নত প্রতিপালনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। একবার তিনি একজন খাদেমকে কিছু লবঙ্গ আনিবার নির্দেশ দিলেন। খাদেম ছয়টি লবঙ্গ লইয়া ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিলেন, 'আমার সূফী ভাই এতটুকুও অবগত নহেন যে, সুন্নতে মোহাম্মাদীতে জোড় অপেক্ষা বেজোড়ই উত্তম। এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কেননা আল্লাহ বেজোড় এবং বেজোড়ই তাঁহার নিকট অধিক পছন্দনীয়। আমিতো মুখ ধুইবার সময়ও খেয়াল রাখি যাহাতে প্রথমে পানি মুখের ডান দিকে পড়ে। কারণ ডান দিককে অগ্রাধিকার দান করা সুন্নত।'

কোন সময় শরীয়তের সামান্যতম নিয়ম পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হইলে তাহার জন্য তিনি অনেক ইস্তেগফার পড়িতেন। তাঁহার পোশাক পরিচ্ছদ ছিল পূর্ণ শরীয়ত সম্মত। প্রায় সময়ই তিনি পাগড়ী ব্যবহার করিতেন। পাগড়ীর 'পুচ্ছ' স্কন্ধ পর্যন্ত রাখিতেন। অধিক লম্বা রাখিতেন না। উহার একপাশে মেসওয়াক বাঁধিয়া রাখিতেন। কোর্তা পরিধান করিতেন; কিন্তু তাহার আস্তিন রাখিতেন শেলাইবিহীন। পাজামা পায়ের টাখনুর উপরে পরিধান করিতেন। জুতা ছিল সাদাসিদা ধরনের। হাতে লাঠি এবং কাঁধে জায়নামাজ রাখিতেন। জুমা ও ঈদের সময় সুসজ্জিত বস্ত্র পরিধান করিতেন।

তিনি স্বদেশে, বিদেশে, শীতকালে, গ্রীষ্মকালে সবসময় অর্ধরাত্রি অতিবাহিত হইবার পর শয্যা হইতে উঠিতেন। প্রথমে এস্তেঞ্জার হাজত পুরা করিতেন। তারপর উত্তমরূপে অজু করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করিতেন এবং নামাজে দণ্ডায়মান হইতেন। প্রথমে দুই রাকাত নামাজ ছোট কেরাতের সহিত আদায় করিতেন। তারপর লম্বা কিরাত সহকারে তাহাজ্জদ নামাজ পড়িতেন। নামাজে প্রায়ই দুই তিন পারা পড়িতেন। কখনও কখনও তাঁহার এমন হুজুরী আসিত যে, এক রাকাতের মধ্যেই সোবহে সাদেকের সময় হইয়া যাইত। খাদেম তখন তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেন যে, রাত শেষ হইয়া যাইতেছে। সেই সময় তিনি সংক্ষিপ্ত কেরাত সহকারে দ্বিতীয় রাকাত আদায় করিয়া লইতেন।

তাহাজ্জদ নামাজে অধিকাংশ সময় তিনি সুরা ইয়াসিন পড়িতেন। তিনি বলিতেন, এই সুরা পাঠে অসংখ্য উপকার পাওয়া গিয়াছে। সুরা আলিফ লাম মিম সেজদা, সুরা মূলক, সুরা মোজ্জাম্মেল, সুরা ওয়াকিয়াহ্ এবং চার কুলও পাঠ করিতেন। নামাজের পর আলে ইমরান সুরার শেষাংশ (ইন্না ফি খালাকিস্ হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িতেন। সত্তর বার আসতাগফিরুল্লাহ্ পড়িতেন। কখনও কখনও 'রব্বি ইন্নি জালামতু নাফসি ফাগফিরুল্লহ' সত্তর বার পড়িতেন। অথবা সোবহে সাদেক পর্যন্ত নিদ্রা যাইতেন যাহাতে দুই নিদ্রার মাঝে তাহাজ্জদ নামাজ পড়া হয়।

তিনি কখনও কখনও প্রথম রাত্রিতেই বেতের নামাজ পড়িয়া লইতেন। আবার কখনও কখনও তাহাজ্জদ নামাজের পর পড়িতেন। প্রথম রাত্রিতে বেতের পড়িয়া লইলে তাহাজ্জদ নামাজ বার রাকাত, দশ রাকাত অথবা আট রাকাত পড়িতেন। বেতের নামাজে প্রথম সুরা সাব্বে হিস্মা, দ্বিতীয় রাকাতে সুরা কাফিরুণ এবং তৃতীয় রাকাতে সুরা ইখলাস পাঠ করিতেন। তৃতীয় রাকাতে সুরা ইখলাসের পর দোয়া কুনুতে হানিফিয়া এবং দোয়া কুনুতে শাফীয়া উভয়েই একত্রে পড়িতেন।

তিনি ফজরের নামাজ বড় জামাতের সহিত আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করিতেন। দোয়ার পর উপস্থিত সবার সহিত একত্রে মোরাকাবায় বসিতেন। দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া মোরাকাবা চলিত। কখনও কখনও হাল্কার মধ্যে হাফেজ সাহেবের নিকট হইতে কোরআন তেলাওয়াত শুনিতেন। অতঃপর সূর্য এক নেজাপরিমাণ উদিত হইলে এশরাক নামাজ পড়িতেন। নামাজ শেষে নির্জন কক্ষে প্রবেশ করিতেন। সেখানে কখনও কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেন কখনও বা কলেমা তৈয়েবা পুনঃ পুনঃ পড়িতে থাকিতেন। সময় সময় তালেবে মাওলাগণকে পৃথক পৃথক ভাবে ডাকিয়া লইয়া তাঁহাদের হাল সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেন। কখনও কখনও কোন প্রশ্ন না করিয়া নিজেই তাঁহাদের গোপন হাল সমূহ বলিয়া দিতেন। আবার কখনও বা বিশেষ বিশেষ মুরিদগণের নিকট গুপ্ত রহস্য সমূহ এবং মারেফতের গূঢ় তত্ত্বসমূহ বর্ণনা করিতেন এবং সেগুলিকে গোপন রাখিবার নির্দেশ দিতেন। তালেবে মাওলাগণের হাল ও যোগ্যতা অনুযায়ী তিনি তাঁহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। তিনি সকলকে উচ্চ মনোবৃত্তিধারী, সুন্নতের অনুসারী, সদা জিকিরকারী এবং হুজুরী সম্পন্ন হইবার জন্য নির্দেশ দিতেন। বাতেনী হাল গোপন রাখিবার জন্যও তিনি তাঁহাদিগকে তাগিদ করিতেন। কলেমা তৈয়েবা পড়ার জন্য তিনি তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন এবং বলিতেন, এই বিশাল সমুদ্রসম কলেমার নিকট সমগ্র জগত এক বিন্দু পানির মতো। ইহা বেলায়েত ও কামালতের সমষ্টি। এই ফকির যাহা জানিতে পারিয়াছে তাহা এই যে, যদি একবার কলেমার বিনিময়ে সমগ্র বিশ্ববাসীকে বেহেশতে প্রবেশ করান হয়– তবে উহাতে তাহারও সংকুলান হওয়া সম্ভব। নিভৃত স্থানে একাকী বসিয়া পুনঃ পুনঃ এই কলেমা পড়িয়া ইহার স্বাদ গ্রহণ করিবার বাসনার সমকক্ষ অন্য কোন বাসনা এই ফকিরের অন্তরে অনুপস্থিত। কিন্তু কি করিব– এই বাসনা পূরণের সুযোগ মিলিল না।'

তিনি মুরিদগণকে ফেকাহ্ শাস্ত্রের কেতাব সমূহ পাঠ করিবার নির্দেশ দিতেন। ইহাতে তাঁহারা ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত, হালাল, হারাম, বেদাত প্রভৃতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করিতে পারিতেন। হজরত তাঁহার সঙ্গীগণকে লইয়া গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহাদের উপর হজরতের প্রভাব এইরূপ ছিল যে, তাঁহারা নিজেদের মধ্যে নড়া চড়া করিবার ক্ষমতা পাইতেন না। তাঁহার মহফিল ছিল পরম শান্তিময়। মহফিলের সবারই চোখ অশ্রুসিক্ত থাকিত। হকিকত বা গুপ্ত রহস্যসমূহের বর্ণনা কালে তাঁহার মুখের রং পরিবর্তন হইয়া যাইত।

হজরত মোজাদ্দেদ র. চাশত্ ও আউয়াবিন নামাজেও অভ্যস্থ ছিলেন। জোহরের নামাজের পরও জিকিরের হালকা বসিত। হাফেজ সাহেব কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেন। মোরাকাবাও অনুষ্ঠিত হইত। তারপর দ্বীনি কেতাব

হইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি শিক্ষা দিতেন। এইভাবে আছরের ওয়াক্ত হইলে নূতন অজু সহকারে বড় জামাতের সহিত আছর নামাজ আদায় করিতেন। তারপর মুরিদান সহ হালকায় বসিতেন এবং হাফেজ সাহেব কোরআন শরীফ পাঠ করিতেন। কখনও মুরিদগণকে জরুরী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। আবার কখনও অন্য কোন নেক কাজে সময় ব্যয় করিতেন। মাগরিব ও এশার নামাজসমূহও তিনি আউয়াল ওয়াক্তে জামাতের সহিত পড়িয়া লইতেন।

তিনি রমজানের শেষ দশদিন মসজিদে 'এতেকাফ' করিতেন। এই সময় তিনি বেশী করিয়া দরুদ শরীফ পড়িতেন এবং ইবাদতে, জিকির আজকারে মশগুল থাকিতেন। জুমআর রাত্রে মুরিদগণকে লইয়া হালকা করিয়া দরুদ শরীফ পাঠ করিতেন। জিলহজ মাসের প্রথম দশদিন তিনি মাথার চুল ও নখ কাটিতেন না। ঈদুল আজহার দিনে রাস্তায় উচ্চস্বরে তকবীর পাঠ করিতেন। তিনি তারাবির নামাজ বিশ রাকাত পাঠ করিতেন। গৃহে ও বিদেশে উহার বেশী-কম হইত না। রোজার মাসে কমপক্ষে তিনবার কোরআন শরীফ খতম করিতেন। তিনি নামাজে অথবা নামাজের বাহিরে এমনভাবে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেন যে, মনে হইত তিনি কেরাতের সহিত তাহার অর্থও উল্লেখ করিতেছেন। শ্রোতাগণ সহজেই বুঝিতে পারিতেন– এই বুজর্গের প্রতি পবিত্র কোরআনের রহস্যসমূহ উন্মুক্ত হইয়া যাইতেছে। যাহারা তাঁহার মুরিদ নহেন তাহারাও বলিতেন যে, 'হজরত যেন কালাম পাকের শব্দগুলি অন্তর হইতে বাহির করেন।'

তারাবির নামাজে অনেকেরই তন্দ্রা অথবা নিদ্রার ভাব আসিত। কিন্তু হজরতের কখনও তন্দ্রা আসিত না। মোল্লা বদরুদ্দিন সেরহিন্দি র. উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'আমি একদিন হজরতের নিকট আরজ করিলাম, আপনার তন্দ্রা না আসার কারণ কি? উত্তরে হজরত বলিলেন, 'কোরআন পাকের রহস্য সমুদ্রে অবগাহন করিবার সময় তন্দ্রা আসিবার অবসর কোথায়?

বিদেশে গমনকালে গন্তব্যস্থানে না পৌঁছানো পর্যন্ত তিনি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতে থাকিতেন। সেজদার আয়াত আসিলে বাহন হইতে তৎক্ষণাৎ নামিয়া সেজদা করিয়া লইতেন। তিনি একাকী নামাজ পড়িবার সময় রুকু ও সেজদায় ঊর্ধ্বে এগারবার ও নিম্নে পাঁচবার তসবিহ্ পড়িতেন। কখনও কখনও পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনবারই পড়িতেন। তিনি বলিতেন, 'ক্ষমতা থাকা অবস্থায় একা নামাজে কম তসবিহ্ পাঠ করিতে লজ্জা করে।' তিনি ইমামতি করিবার সময় রুকু ও সেজদায় এইরূপ সময় ব্যয় করিতেন– যাহাতে মোক্তাদীগণ তিনবার তসবিহ্ পড়িতে পারেন। তিনি ভাল মন্দ সকল লোকের পিছনে নামাজ পড়া জায়েজ মনে করিতেন এবং ভাল মন্দ প্রত্যেক ব্যক্তির জানাজার নামাজ পড়িতেন।

এ সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। হজরত মোজাদ্দেদ র. মকতুবাত শরীফে ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন–

‘একদিন এই ফকির এক রোগগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে গিয়াছিল। তাহার ছিল মুমূর্ষু অবস্থা। তাহার কলবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম যে, তাহা অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন। অন্ধকার অপসারণের জন্য চেষ্টা করিলাম– কিন্তু কোন ফল হইল না। অনেকবার লক্ষ্য করার পর বুঝিলাম যে, উক্ত অন্ধকার সেফাতে কুফর বা কুফরগুণ হইতে আগত। কাফেরদের সহিত বন্ধুত্বের কারণে উক্ত অন্ধকার তাহার কলবের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। তাওয়াজ্জোহ দ্বারা এইরূপ অন্ধকার অপসারিত হয় না। ইহার অপসারণ কুফরের প্রতিফল দোজখের শাস্তির প্রতি নির্ভরশীল। আমি ইহাও জানিতে পারিলাম যে, এত অন্ধকার সত্ত্বেও তাহার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে যাহার বরকতে সে দোজখের শাস্তি পাইবার পর অবশেষে মুক্তি পাইবে। এই অবস্থায় তাহার জানাজার নামাজে অংশগ্রহণ করা উচিত হইবে কিনা তাহা ভাবিতে লাগিলাম। কিন্তু লক্ষ্য করার পর জানিলাম, জানাজার নামাজ পড়িতে হইবে। অতএব, যে মুসলমান ঈমান রাখা সত্ত্বেও কাফেরদের রীতি নীতি মানে ও তাহাদের নির্দিষ্ট দিনসমূহের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব রাখে তাহাদের জানাজা পড়িতে হইবে।...’

কাফেরদের সংস্রব যে কত মারাত্মক এই ঘটনায় তাহা উপলব্ধি করা যায়। কুফরের শাস্তি একমাত্র দোজখ। তাওয়াজ্জোহ এর সাহায্যে কুফরের তমসা বিদূরিত হয় না। এই কারণেই হজরত মোজাদ্দেদ র. তাহাদের সংস্রব হইতে দূরে থাকিতে এবং তাহাদের প্রতি সামান্য পরিমাণ মহব্বতও না রাখিবার জন্য বিশেষ তাগিদ দিতেন। যেমন তিনি লিখিয়াছেন–

‘বিধর্মী কাফেরগণ যাহারা আল্লাহ্ এবং রসূল স. এর দুশমন তাহাদিগকে দুশমনই ধারণা করা উচিত এবং তাহাদেরকে অপমান করিবার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকিতে হইবে। কোন অবস্থাতেই তাহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত নয়। ঐ সমস্ত হতভাগাদিগকে মজলিশে স্থান দেওয়া বা তাহাদের সহিত দোস্তী রাখা অনুচিত। উহারা সব সময় কর্কশ ব্যবহার পাইবার যোগ্য। কোন কাজের জন্য তাহাদের শরণাপন্ন হওয়া উচিত নয়। একান্ত কোন প্রয়োজনের তাগিদে যদি তাহাদের নিকট যাইবার আবশ্যকতা দেখা দেয়, তাহা হইলে মলমূত্র পরিত্যাগের জন্য যেমন বাধ্য হইতে হয়, তেমনি অনিচ্ছাকৃতভাবে তাহাদের নিকটে যাইয়া প্রয়োজন মিটাইতে হইবে।....’

হজরত মোজাদ্দেদ র. এই বিষয়ে আরও এক মকতুবে লিখিয়াছেন, 'কাফেরের সহিত হিংসাভাব পোষণ করার মধ্যেই ইসলামের সম্মান নিহিত। আল্লাহ্পাক কোরআন শরীফে তাহাদেরকে এক জায়গায় 'নাজাছ' বা অপবিত্র এবং অন্য এক জায়গায় 'রেজেছ' বা অশৌচ আখ্যা দিয়াছেন। সুতরাং মুসলমানের দৃষ্টিতে তাহাদেরকে অপবিত্রই দেখা উচিত।.....'

হজরত মোজাদ্দেদ আলফে সানি র. এলমে শরীয়ত ও মারেফাত বিষয়ক বহু কেতাব লিখিয়াছেন। উহাদের মধ্যে যে সমস্ত কেতাবের সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলি হইল (১) এসবাতুন নবুয়ত, (২) রেসালায়ে মাবদা ওয়া মাআদ, (৩) শরহে রোবাইয়াত, (৪) রেসালায়ে মাআরিফে লাদুন্নিয়া, (৫) রেসালায়ে আদাবুল মুরিদিন, (৬) রেসারায়ে তাহলিলিয়া, (৭) রেসারায়ে মুকাশিফাতে আয়নিয়া. (৮) রেসালায়ে হালাতে খাজেগানে নক্শবন্দ, (৯) তালিমাতে আওয়ারেফ, (১০) রেসালায়ে রদ্দে রাওয়াফেজ ও (১১) রেসালায়ে ইলমুল হাদিস।

এইগুলি ছাড়াও তাঁহার লিখিত ৭৩৪ খানি অমূল্য পত্র রহিয়াছে। এগুলিকে একত্রে মকতুবাত শরীফ বলা হয়। মকতুবগুলি মোট তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের নাম 'দুররুল মারেফাত' অর্থাৎ 'মারেফাত মনি।' এইখণ্ডে মোট ৩১৩ খানি মকতুব রহিয়াছে। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর খলিফা খাজা ইযার মোহম্মদ জদীদ বদখ্শী তালকানী র. এই মকতুব সমূহ একত্রিত করিয়াছিলেন।

নিরানব্বইখানি মকতুব সমন্বয়ে গঠিত দ্বিতীয় খণ্ড মকতুবের নাম 'নুরুল মারেফাত' অর্থাৎ মারেফাত দ্যুতি।' এই মকতুবগুলি একত্রিত করিয়াছিলেন তাঁহার খলিফা হজরত মাওলানা আবদুল হাই হেসারী র.

তৃতীয় খণ্ড মকতুবাত শরীফে মোট দুই শত বারখানি মকতুব স্থান পাইয়াছে। তাঁহার খলিফা খাজা মোহাম্মদ হাশেম বোরহানপুরী র. এই মকতুবসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই খণ্ডের নাম 'মারেফাতুল হাকায়েক' অর্থাৎ 'মারেফাত মূল।'

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর শরীর মোবারক ছিল সুসঙ্গত ও সুন্দর। তাঁহার পবিত্র শরীরের রং ছিল গম বর্ণ। তাঁহার সহিত ছিল কিঞ্চিৎ শুভ্রতার মিশ্রণ। তিনি ছিলেন মধ্যম আকৃতির। তাঁহার চেহারা ছিল নূরে পরিপূর্ণ। তাঁহার ললাটদেশ ও বুক হইতে এত নূর বিচ্ছুরিত হইত যাহাতে দর্শকের চোখ ঝলসিয়া যাইত। তাঁহার মোবারক শরীরে ময়লা জামিত না। গ্রীষ্ম, বর্ষা, কোন ঋতুতেই তাঁহার ঘামে কোনরূপ দুর্গন্ধ হইত না। তাঁহার ললাট মোবারক ছিল প্রশস্ত ও সমতল। ললাটে সেজদার চিহ্ন ছিল এবং ললাট হইতে নাকের অগ্রভাগ

পর্যন্ত একটি ঈষৎ লাল বর্ণের সরল রেখা সদা উদ্ভাসিত থাকিত। ইহা তাহার মোজাদ্দেদ হওয়ার চিহ্ন। তাঁহার ভ্রূযুগল ছিল কালো ও সরু। চোখ ছিল ডাগর ও লাল। চোখের কালো অংশ ছিল গাঢ় কালো। শ্মশ্রু ঘন, মধ্যম প্রকারের। মুখমণ্ডল স্বাভাবিক। ওষ্ঠের রং ছিল লোহিতাভ। মোবারক দন্তসমূহ সুবিন্যস্ত এবং মুক্তার মত উজ্জ্বল ছিল। তাঁহার হাতের আঙ্গুল ছিল সরু ও লম্বা। কদম মোবারক হালকা ধরনের এবং উহাদের পার্শ্বদেশ ছিল পরিস্কার। তাঁহার বুকে লোমপূর্ণ একটি চিকন রেখা নাভি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার চুল মোবারক বেশীরভাগ সাদা ছিল।

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সাহেবজাদা ছিলেন সাত জন এবং সাহেবজাদী ছিলেন তিন জন। সাহেবজাদাগণ হইলেন– (১) হজরত খাজা মোহাম্মদ সাদেক র.। (২) হজরত খাজা মোহাম্মদ সাঈদ র.। (৩) হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র.। (৪) হজরত মোহাম্মদ ঈসা র.। (৫) হজরত মোহাম্মদ ফররুখ র.। (৬) হজরত মোহাম্মদ আশরাফ র.। (৭) হজরত শাহ্ মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া র.।

সাহেবজাদীগণ হইলেন– (১) হজরত রোকেয়া র.। (২) হজরত খাদীজা বানু র.। (৩) হজরত উম্মে কুলসুম র.। তাহারা সকলেই শিশুকালে ইন্তেকাল করেন।

হজরত খাজা মোহাম্মদ সাদেক র. ছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান। তিনি অতি অল্প বয়সেই জাহেরী ও বাতেনী এলেমে কামালিয়াত হাসিল করেন। মাত্র আঠার বৎসর বয়সে তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া ইন্তেকাল করেন।

হজরত খাজা মোহাম্মদ সাঈদ র. মাত্র সতের বৎসর বয়সে সমস্ত এলেম শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ইহার পর কিছুকাল তিনি অধ্যাপনা করেন। তিনি কয়েকটি কেতাবও রচনা করেন। তিনি মুজতাহিদ ছিলেন। বাতেনী সম্পদেও তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'এক সময় আমি কেয়ামত, মীজানে আমলের ওজন এবং আমার সিলসিলাভুক্ত মুরিদগণের পুলসিরাত অতিক্রমের দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, আমার পুত্র সাঈদ ডান হাতে আমলনামা লইয়া সবার সামনে চলিতেছেন। অবশেষে আমরা সকলে তাঁহার সহিত বেহেশতে প্রবেশ করিলাম।'

হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. ছিলেন তাঁহার তৃতীয় পুত্র। তাঁহার জন্মগ্রহণের পর রসূলে পাক স. রূহানী ভাবে হজরত মোজাদ্দেদ র. কে জানাইয়া দেন, 'তোমার এই সন্তানের নাম মোহাম্মদ মাসুম রাখিও। কারণ, সে সমস্ত জীবনই মাসুম (নিষ্পাপ) থাকিবে।'

হজরত মোজাদ্দেদ র. নিজেই তাঁহাকে শিক্ষাদান করেন। তিনি মাত্র তিন মাসে কোরআন শরীফ হেফ্জ করিয়া ফেলেন। ষোল বৎসর বয়সে জাহেরী এলেম শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি মারেফাত সাধনায় লিপ্ত হন এবং অল্পদিনের মধ্যেই পিতার নিকট হইতে খেলাফত লাভ করেন। হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. কাইয়ুমিয়াত হাসিল করেন এবং 'কাইয়ুমে সানি' উপাধিতে ভূষিত হন। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সমস্ত খলিফাগণের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। পিতার ইন্তেকালের পর তিনি গদ্দিনশীল হন। সেইদিন পঞ্চাশ হাজার লোক তাঁহার নিকট বায়াত হইয়াছিলেন।

হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর নয় লক্ষ মুরিদ এবং সাত হাজার খলিফা ছিলেন। তিনি হিজরী ১০৫৬ সালে সাতশত সঙ্গীসহ হজ করিতে যান। তখন পথে প্রতিদিন গড়ে সাড়ে সাত হাজার লোক তাঁহার নিকট বায়াত হইতেন।

তিনি বলিয়াছেন, 'রবিউল আউয়াল মাসে আমরা মক্কা শরীফ হইতে মদীনা শরীফে যাই। পথে হজরত রসূলে পাক স. এবং তাঁহার সাহাবা রা.গণের পবিত্র স্মৃতিবিজড়িত মসজিদসমূহ আমরা জিয়ারত করি। সেই রাত্রে রসূলে পাক স. এর রওজা মোবারক জেয়ারতের প্রবল আকাংখা হয় এবং আমার প্রতি এত পরিমাণ নূর বর্ষিত হয় যে, আমি সমস্ত রাত্রি উপবিষ্ট অবস্থায় কাটাইয়া দেই। পরদিন প্রভাতে প্রায় উন্মাদ অবস্থায় তাঁহার পবিত্র দরবারে হাজির হইয়া লুটাইয়া পড়ি। প্রবাসী সন্তান বহুদিন পরে গৃহে আসিলে পিতা যেমন পরম স্নেহে সন্তানকে বুকে জড়াইয়া ধরেন, তেমনি রহমাতুল্লিল আলামিন হাবীবে পাক স. আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং মমতার পরশ বুলাইয়া দিলেন। কয়েকদিন পর আমি 'জান্নাতুল বাকী' জেয়ারত কালে আমিরুল মোমেনীন হজরত ওসমান রা. এবং আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রা. রূহানীভাবে আমাকে অনেক মেহেরবানী করেন।'

হজরত খাজা মোহাম্মদ ফররুখ র. মাত্র এগার বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি প্রায়ই দোয়া করিতেন, 'ইয়া আল্লাহ্! আখেরাতের আজাব সহ্য করিবার ক্ষমতা আমার নাই। বড় হইয়া গোনাহ্ করিব বলিয়া ভয় হয়। কাজেই বাল্য বয়সেই তুমি আমাকে দুনিয়া হইতে উঠাইয়া লও।'

হজরত খাজা মোহাম্মদ ঈসা র. এর জন্মের সময় হজরত মোজাদ্দেদ র. স্বপ্নে হজরত ঈসা আ. এর দর্শন লাভ করেন। তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. কে বলেন, 'তোমার এই সন্তানের নাম আমার নামে রাখিও।' হজরত খাজা মোহাম্মদ ঈসা র. মাত্র আট বৎসর জীবিত ছিলেন। এই অল্প বয়সেও তাঁহার অনেক কারামত প্রকাশ পাইয়াছিল।

হজরত খাজা মোহাম্মদ আশরাফ র. 'মাদারজাদ অলি' অর্থাৎ জন্মগত অলি ছিলেন। তিনি মাত্র দুই বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। এই শিশু বয়সেও তাঁহার মধ্যে অনেক অলৌকিক বিষয় পরিলক্ষিত হয়।

হজরত খাজা মোহাম্মদ ইয়াহইয়া র. ছিলেন তাঁহার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার নয় বৎসর বয়সের সময় হজরত মোজাদ্দেদ র. ইন্তেকাল করেন। পিতার অবর্তমানে কাইয়ুমে সানি হজরতম খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. তাঁহাকে বাতেনী এলেম শিক্ষা দেন।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর পাঁচ হাজার খলিফা ছিলেন। তাঁহার খলিফাগণের মাধ্যমে চলিয়া আসা সিলসিলার নাম নকশবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া। শুধুমাত্র কাইয়ুমে সানি হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর মাধ্যমে চলিয়া আসা সিলসিলার নাম তরিকায়ে খাছ মোজাদ্দেদিয়া। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর খাছ কামালাত ও নেসবত এই সিলসিলার মাধ্যমেই জারী রহিয়াছে।

'নূরে সেরহিন্দ' কেতাব সমাপ্ত হইতেছে। কিন্তু ইহার সমাপ্তি হওয়া উচিত ছিল না। ইশকের কাহিনীর কি শেষ আছে?

জীবন চলিয়া যায় কখন কি জানি–
অন্ত নাহি জানে কভু ইশকের কাহিনী।
বিরহ যাতনায় পোড়ে কামনা বাসনা
'আরেনি' 'আরেনি' বলে প্রতি রক্তকণা ।
কেমনে ভুলিব বল প্রভুর স্মরণ?
তাহাতেই সমর্পিত যে জীবন মরণ।

যাঁহারা হেদায়েতের পথের পথিক এবং হজরত মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ স. এর একনিষ্ঠ অনুসারী, তাঁহাদের প্রতি সালাম।

ISBN 984-70240-0028-3